অষ্টবিংশতি অধ্যায়

পরবর্তী জন্মে পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি

শ্লোক ১

নারদ উবাচ

সৈনিকা ভয়নাম্নো যে বর্হিষ্মন্ দিষ্টকারিণঃ ।
প্রজ্বারকালকন্যাভ্যাং বিচেরুরবনীমিমাম্ ॥ ১ ॥

নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; **সৈনিকাঃ**—সৈনিকেরা; **ভয়-নাম্নঃ**—ভয়ের; **যে**—তারা সকলে; **বর্হিষ্মন্**—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ; **দিষ্ট-কারিণঃ**—মৃত্যুর আজ্ঞাবাহক; **প্রজ্বার**—প্রজ্বারসহ; **কাল-কন্যাভ্যাম্**—কালকন্যা-সহ; **বিচেরুঃ**—ভ্রমণ করছিলেন; **অবনীম্**—পৃথিবীতে; **ইমাম্**—এই।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! তারপর ভয় নামক যবনরাজ প্রজ্বার, কালকন্যা এবং তার সৈনিকগণ সহ সারা পৃথিবী বিচরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মৃত্যুর ঠিক পূর্বে জীবনের অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়, কারণ সেই সময় মানুষ বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা এবং নানা প্রকার রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। যে-সমস্ত রোগ শরীরকে আক্রমণ করে, তাদের এখানে সৈনিকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই সমস্ত সৈনিকেরা সাধারণ সৈনিক নয়, কারণ তাদের সেনাপতি হচ্ছেন যবনরাজ এবং তাঁর দ্বারা তারা পরিচালিত হয়। এখানে *দিষ্টকারিণঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি হচ্ছেন তাদের সেনাপতি। যৌবন অবস্থায় মানুষ বার্ধক্যের পরোয়া না করে, যথাসম্ভব স্ত্রীসম্ভোগ করার চেষ্টা করে। সে জানে না যে, এই স্ত্রীসম্ভোগের ফলে তার নানা প্রকার রোগ হবে। এবং তার ফলে শরীরে এমন যন্ত্রণা সৃষ্টি হবে যে, সে তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, যাতে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়। মানুষ যৌবনে যত স্ত্রীসম্ভোগ করে, বার্ধক্যে তাকে ততই কষ্ট পেতে হয়।

শ্লোক ২

ত একদা তু রভসা পুরঞ্জনপুরীং নৃপ ।
রুরুধুর্ভৌমভোগাঢ্যাং জরৎপন্নগপালিতাম্ ॥ ২ ॥

তে—তারা; **একদা**—এক সময়; **তু**—তখন; **রভসা**—প্রচণ্ড বেগে; **পুরঞ্জন-পুরীম্**—পুরঞ্জনের নগরী; **নৃপ**—হে রাজন; **রুরুধুঃ**—অবরোধ করেছিল; **ভৌম-ভোগ-আঢ্যাম্**—ইন্দ্রিয়ভোগে পূর্ণ; **জরৎ**—বৃদ্ধ; **পন্নগ**—সর্পের দ্বারা; **পালিতাম্**—রক্ষিত।

অনুবাদ

এক সময় সেই ভয়ঙ্কর সৈনিকেরা প্রবলভাবে পুরঞ্জনের নগরী আক্রমণ করেছিল। যদিও সেই নগরীটি ইন্দ্রিয় সুখভোগের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু তা রক্ষিত হচ্ছিল একটি বৃদ্ধ সর্পের দ্বারা।

তাৎপর্য

দেহ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে মগ্ন হলে, তা প্রতিদিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। অবশেষে প্রাণশক্তি এতই ক্ষীণ হয়ে যায় যে তাকে এখানে একটি বৃদ্ধ সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রাণশক্তিকে পূর্বেই একটি সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণশক্তি যখন দুর্বল হয়ে যায়, তখন দেহও দুর্বল হয়ে যায়। এই সময় মৃত্যুর লক্ষণগুলি, অর্থাৎ, যমরাজের ভয়ঙ্কর সৈনিকেরা অত্যন্ত প্রবলভাবে আক্রমণ করে। বৈদিক প্রথা অনুসারে, এই অবস্থা প্রাপ্ত হবার পূর্বেই, জীবনের বাকি সময় ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য গৃহত্যাগ করে, সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু মানুষ যদি গৃহেই বসে থাকে এবং প্রিয়তমা পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের দ্বারা সেবিত হয়, তা হলে অবশ্যই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার ফলে, সে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। অবশেষে যখন মৃত্যু আসে, তখন আধ্যাত্মিক সম্পদবিহীন হয়ে তাকে দেহত্যাগ করতে হয়। বর্তমান সময়ে পরিবারের সবচাইতে বৃদ্ধ মানুষও পত্নী, সন্তান-সন্ততি, ধনসম্পদ, গৃহ ইত্যাদি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে গৃহত্যাগ করে না। তার ফলে জীবনের অন্তিম সময়েও তারা চিন্তা করে কে তার পত্নীকে রক্ষা করবে এবং সে কিভাবে বিশাল পরিবারের দায়দায়িত্ব সামলাবে। এইভাবে মানুষ মৃত্যুর পূর্বে সাধারণত তার পত্নীর কথা চিন্তা করে। *ভগবদ্গীতায়* (৮/৬) বর্ণনা করা হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"মৃত্যুর সময় মানুষ যে বিষয়ে চিন্তা করে, নিঃসন্দেহে সে সেই ভাব প্রাপ্ত হবে।"

মানুষ সারা জীবন যা করে, সেই কথাই সে অন্তিম সময়ে চিন্তা করে; তার ফলে তার চিন্তা এবং অন্তিম সময়ের বাসনা অনুসারে, সে আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়। যারা গৃহস্থ-জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা স্বাভাবিকভাবেই জীবনের অন্তিম সময়ে তার প্রিয়তমা পত্নীর কথা মনে করে। তার ফলে পরবর্তী জীবনে সে একটি স্ত্রী শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং সে তার পাপ অথবা পুণ্য কর্মের ফলভোগ করে। এই অধ্যায়ে রাজা পুরঞ্জনের স্ত্রীদেহ প্রাপ্তির বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্লোক ৩

কালকন্যাপি বুভুজে পুরঞ্জনপুরং বলাৎ ।
যয়াভিভূতঃ পুরুষঃ সদ্যো নিঃসারতামিয়াৎ ॥ ৩ ॥

কাল-কন্যা—কালকন্যা; **অপি**—ও; **বুভুজে**—অধিকার করেছিল; **পুরঞ্জন-পুরম্**—পুরঞ্জনের নগরী; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **যয়া**—যার দ্বারা; **অভিভূতঃ**—পরাভূত হয়ে; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **নিঃসারতাম্**—নির্জীবত্ব; **ইয়াৎ**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

ভয়ঙ্কর সৈনিকদের সহায়তায়, কালকন্যা ধীরে ধীরে পুরঞ্জনের নগরীর সমস্ত অধিবাসীদের আক্রমণ করেছিল এবং তাদের সর্বতোভাবে নিষ্ক্রিয় করেছিল।

তাৎপর্য

জীবনের শেষে যখন জরা মানুষকে আক্রমণ করে, তখন তার শরীর সর্বতোভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তাই বৈদিক প্রথায় মানুষকে বাল্যকাল থেকেই ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দেওয়া হয়, অর্থাৎ তিনি পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন এবং মেয়েদের সঙ্গে তখন আর কোন রকম সম্পর্ক থাকে না। মানুষ যখন বাল্যাবস্থা থেকে যৌবন প্রাপ্ত হয়, তখন কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে সে বিবাহ করে। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করলে, সুস্থ সবল পুত্রের জন্ম হয়। এখন মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ পুরুষেরা তাদের পুরুষত্ব হারিয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। পতি যখন পত্নী থেকে অধিক বলবান হয়, তখন পুত্র-সন্তানের জন্ম হয়, কিন্তু পত্নী যদি অধিক বলবান হয়, তা হলে কন্যার জন্ম হয়। বিবাহের ফলে পুত্র সন্তান লাভ করতে হলে, ব্রহ্মচর্য পালন করা অবশ্য কর্তব্য। পঞ্চাশ বছর বয়সে

পারিবারিক জীবন পরিত্যাগ করা উচিত। তখন সন্তানেরাও বড় হয়ে যায় এবং পিতা তখন পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করতে পারেন। তখন পতি ও পত্নী দূর দেশে গিয়ে অবসর গ্রহণ করতে পারেন এবং বিভিন্ন তীর্থস্থানে ভ্রমণ করতে পারেন। পতি ও পত্নী উভয়েই যখন গৃহ ও পরিবারের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করেন, তখন পত্নী গৃহে ফিরে এসে, উপযুক্ত পুত্রদের সংরক্ষণে গৃহস্থালির ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গৃহে বাস করতে পারেন। তখন পতি ভগবানের সেবা করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

এটিই হচ্ছে সভ্য মানব-সমাজের রীতি। মানব-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবৎ উপলব্ধি। জীবনের শুরু থেকেই যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করা যায়, তা হলে অন্তত জীবনের শেষ সময়ে সেই শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। দুর্ভাগ্যবশত, শৈশবে সেই সম্বন্ধে কোন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না, এবং জীবনের শেষ সময়েও মানুষ তার পারিবারিক জীবন ত্যাগ করতে পারছে না। পুরঞ্জনের নগরীর আখ্যান বর্ণনায় রূপক ছলে, এই শ্লোকগুলিতে সেই পরিস্থিতিরই বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪

তয়োপভুজ্যমানাং বৈ যবনাঃ সর্বতোদিশম্ ।
দ্বার্ভিঃ প্রবিশ্য সুভৃশং প্রার্দয়ন্ সকলাং পুরীম্ ॥ ৪ ॥

তয়া—কালকন্যার দ্বারা; **উপভুজ্যমানাম্**—অধিকৃত হয়ে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **যবনাঃ**—যবনেরা; **সর্বতঃ-দিশম্**—চারদিক থেকে; **দ্বার্ভিঃ**—দ্বার দিয়ে; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **সু-ভৃশম্**—অত্যন্ত; **প্রার্দয়ন্**—কষ্ট দিয়ে; **সকলাম্**—সর্বত্র; **পুরীম্**—নগরী।

অনুবাদ

কালকন্যা যখন দেহ আক্রমণ করল, তখন যবনরাজের ভয়ঙ্কর সৈনিকেরা বিভিন্ন দ্বার দিয়ে সেই নগরীতে প্রবেশ করেছিল, এবং তারা সমস্ত নাগরিকদের প্রবলভাবে পীড়ন করতে শুরু করেছিল।

তাৎপর্য

দেহের নটি দ্বার—দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, দুটি নাসারন্ধ্র, মুখ, পায়ু ও উপস্থ। মানুষ যখন জরাগ্রস্ত হয়, তখন দেহের বিভিন্ন দ্বারে নানা রকম ব্যাধি দেখা দেয়। যেমন,

দৃষ্টিশক্তি এত ক্ষীণ হয়ে যায় যে, চশমার প্রয়োজন হয়, শ্রবণ শক্তি এত দুর্বল হয়ে যায় যে, স্পষ্টভাবে কিছু শোনা যায় না, এবং তাই তখন শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। শ্লেষ্মায় নাক বন্ধ হয়ে যায়, এবং তাই সর্বদা নাক পরিষ্কার করার জন্য শিশিতে অ্যামোনিয়া নিয়ে তা শুঁকতে হয়, তেমনই খাদ্য চর্বণ করার জন্য নকল দাঁতের আবশ্যকতা হয়। পায়ুতে নানা প্রকার গোলযোগের জন্য মলত্যাগ করতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। কখনও কখনও তাই এনিমা নিতে হয় এবং প্রস্রাব করার জন্য সার্জিকাল নজেল ব্যবহার করতে হয়। এইভাবে পুরঞ্জনের নগরীর বিভিন্ন দ্বার সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এইভাবে বার্ধক্যে বিভিন্ন রোগের দ্বারা শরীরের সমস্ত দ্বারগুলি রুদ্ধ হয়ে যায়, এবং তখন নানা প্রকার ঔষধ এবং শল্য উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

শ্লোক ৫

তস্যাং প্রপীড্যমানায়ামভিমানী পুরঞ্জনঃ ।
অবাপোরুবিধাংস্তাপান্ কুটুম্বী মমতাকুলঃ ॥ ৫ ॥

তস্যাম্—সেই নগরী যখন; **প্রপীড্যমানায়াম্**—বিবিধ প্রকার পীড়া অনুভব করছিল; **অভিমানী**—অত্যন্ত লিপ্ত; **পুরঞ্জনঃ**—রাজা পুরঞ্জন; **অবাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **উরু**—বহু; **বিধান্**—প্রকার; **তাপান্**—বেদনা; **কুটুম্বী**—স্বজনপ্রিয় ব্যক্তি; **মমতা-আকুলঃ**—পারিবারিক আসক্তির দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত।

অনুবাদ

নগরীটি যখন এইভাবে কালকন্যা ও সৈনিকদের দ্বারা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েছিল, তখন রাজা পুরঞ্জন তার আত্মীয়-স্বজনদের মমতায় অত্যন্ত আকুল হয়ে, যবনরাজ ও কালকন্যার আক্রমণে বহু প্রকার ক্লেশ ভোগ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

আমরা যখন শরীরের উল্লেখ করি, তখন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত স্থূল দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহংকারকে বোঝান হয়। যখন এগুলি বিভিন্ন প্রকার ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন বার্ধক্যে সেগুলি দুর্বল হয়ে যায়। দেহের মালিক জীবাত্মা তখন যথাযথভাবে তার কর্মের ক্ষেত্রকে ব্যবহার করতে না পারার ফলে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, জীব হচ্ছে এই দেহের মালিক (*ক্ষেত্রজ্ঞ*) এবং দেহটি হচ্ছে তার কর্মের ক্ষেত্র। ক্ষেত্র যখন

নানা প্রকার আগাছায় ভরে যায়, তখন মালিকের পক্ষে সেখানে কাজ করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে ওঠে। দেহ যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন আত্মার পক্ষে দেহের ভার বহন করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। তখন দুশ্চিন্তা এবং দেহের কার্যকলাপের অবনতির ফলে, দেহটি আত্মার পক্ষে একটি মস্ত বড় বোঝার মতো হয়ে দাঁড়ায়।

শ্লোক ৬

কন্যোপগূঢ়ো নষ্টশ্রীঃ কৃপণো বিষয়াত্মকঃ ।
নষ্টপ্রজ্ঞো হৃতৈশ্বর্যো গন্ধর্বযবনৈর্বলাৎ ॥ ৬ ॥

কন্যা—কালকন্যার দ্বারা; **উপগূঢ়ঃ**—আলিঙ্গিত হয়ে; **নষ্ট-শ্রীঃ**—সমস্ত সৌন্দর্য-রহিত হয়ে; **কৃপণঃ**—কৃপণ; **বিষয়-আত্মকঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগে আসক্ত; **নষ্ট-প্রজ্ঞঃ**—বুদ্ধিবিহীন; **হৃত-ঐশ্বর্যঃ**—ঐশ্বর্যহীন; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বদের দ্বারা; **যবনৈঃ**—যবনদের দ্বারা; **বলাৎ**—বলপূর্বক।

অনুবাদ

কালকন্যার দ্বারা আলিঙ্গিত হওয়ার ফলে, রাজা পুরঞ্জন তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলেন। রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, তাঁর বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছিল এবং সমস্ত ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে সবকিছু হারিয়ে, তিনি গন্ধর্ব ও যবনদের দ্বারা বলপূর্বক পরাভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যখন মানুষ জরা ও বার্ধক্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, সে তখন ধীরে-ধীরে তার সৌন্দর্য, বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য হারিয়ে ফেলে। তার ফলে সে কালকন্যার প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না।

শ্লোক ৭

বিশীর্ণাং স্বপুরীং বীক্ষ্য প্রতিকূলাননাদৃতান্ ।
পুত্রান্ পৌত্রানুগামাত্যাঞ্জায়াং চ গতসৌহৃদাম্ ॥ ৭ ॥

বিশীর্ণাম্—জীর্ণ হয়ে গেছে; **স্ব-পুরীম্**—তাঁর নগরী; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **প্রতিকূলান্**—প্রতিকূল বিষয় সমূহ; **অনাদৃতান্**—শ্রদ্ধাহীন হয়েছে; **পুত্রান্**—পুত্র;

পৌত্র—পৌত্র; **অনুগ**—ভৃত্য; **অমাত্যান্**—মন্ত্রী; **জায়াম্**—পত্নী; **চ**—এবং; **গত-সৌহৃদাম্**—উদাসীন।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন তখন দেখলেন যে, তাঁর নগরীর সমৃদ্ধি নষ্ট হয়েছে এবং তাঁর পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য ও অমাত্যেরা ধীরে ধীরে তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তিনি এও দেখলেন যে, তাঁর পত্নী তাঁর প্রতি প্রীতিরহিত এবং উদাসীন হয়ে গেছে।

তাৎপর্য

কেউ যখন জরাগ্রস্ত হয়, তখন তার ইন্দ্রিয়গুলি এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি দুর্বল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তখন আর তার সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকে না। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি তখন তার বিরোধিতা করতে শুরু করে। মানুষ যখন কষ্টে থাকে, তখন তার আত্মীয়-স্বজনেরা, পুত্র, পৌত্র এবং পত্নীও তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শুরু করে। তারা তখন আর গৃহস্বামীর কর্তৃত্বাধীনে থাকে না। মানুষ যেমন তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করে, তেমনই ইন্দ্রিয়গুলিরও শরীর থেকে শক্তির আবশ্যকতা হয়। মানুষ সুখভোগের জন্য তার পরিবার গড়ে তোলে, তেমনই তার পরিবারের সদস্যেরাও পরিবারের কর্তার কাছ থেকে সুখ দাবি করে। তারা যখন তার কাছ থেকে যথেষ্ট টাকা পয়সা পায় না, তখন তারা তার প্রতি উদাসীন হয়ে তাকে অবজ্ঞা করে এবং তার আদেশ আমান্য করে। সেই সবের কারণ হচ্ছে যে, সে একটি কৃপণ। ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যবহৃত এই *কৃপণ* শব্দটি *ব্রাহ্মণ* শব্দটির বিপরীত। মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হলে, জীবের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ হওয়া, অর্থাৎ, পরম সত্য পরম ব্রহ্মের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করে, বৈষ্ণবরূপে তাঁর সেবা করা। মনুষ্য-জীবনে আমরা এই সুযোগটি পাই, কিন্তু আমরা যদি এই সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহার না করি, তা হলে আমরা কৃপণে পরিণত হই। কৃপণ হচ্ছে সে, যার ধন থাকা সত্ত্বেও যথাযথভাবে তা ব্যয় করে না। মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা, ব্রাহ্মণ হওয়া। কিন্তু আমরা যদি সেই সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার না করি, তা হলে আমরা কৃপণ হয়ে থাকি। আমরা দেখতে পাই যে, ধন থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি তা ব্যয় না করে, তা হলে সেই কৃপণ কখনও সুখী হতে পারে না। তেমনই, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ফলে বুদ্ধি যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে আজীবন কৃপণ হয়ে থাকে।

শ্লোক ৮

আত্মানং কন্যয়া গ্রস্তং পঞ্চালানরিদূষিতান্ ।
দুরন্তচিন্তামাপন্নো ন লেভে তৎপ্রতিক্রিয়াম্ ॥ ৮ ॥

আত্মানম্—স্বয়ং; **কন্যয়া**—কালকন্যার দ্বারা; **গ্রস্তম্**—আলিঙ্গিত হয়ে; **পঞ্চালান্**—পঞ্চাল; **অরি-দূষিতান্**—শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত; **দুরন্ত**—দুর্লঙ্ঘ্য; **চিন্তাম্**—দুশ্চিন্তা; **আপন্নঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **ন**—না; **লেভে**—লাভ করেছে; **তৎ**—তার; **প্রতিক্রিয়াম্**—প্রতিক্রিয়া।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন যখন দেখলেন যে, তাঁর আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য, অমাত্য আদি সকলেই তাঁর বিরোধী হয়ে গেছে, তখন তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই পরিস্থিতির সংশোধন করতে পারলেন না, কারণ তিনি কালকন্যার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মানুষ যখন বার্ধক্যে দুর্বল হয়ে যায়, তখন তার আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য ও অমাত্যেরা তাকে আর গ্রাহ্য করে না। তখন সে সেই পরিস্থিতির প্রতিকার করতে পারে না। এইভাবে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে, সে তার শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য অনুতাপ করতে থাকে।

শ্লোক ৯

কামানভিলষন্দীনো যাতযামাংশ্চ কন্যয়া ।
বিগতাত্মগতিস্নেহঃ পুত্রদারাংশ্চ লালয়ন্ ॥ ৯ ॥

কামান্—ইন্দ্রিয়-সুখের বিষয়; **অভিলষন্**—সর্বদা অভিলাষ করে; **দীনঃ**—দরিদ্র ব্যক্তি; **যাত-যামান্**—বাসী; **চ**—ও; **কন্যয়া**—কালকন্যার প্রভাবের দ্বারা; **বিগত**—হারিয়ে; **আত্ম-গতি**—জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য; **স্নেহঃ**—আসক্তি; **পুত্র**—পুত্র; **দারান্**—পত্নী; **চ**—এবং; **লালয়ন্**—স্নেহভরে পালন করেছিলেন।

অনুবাদ

কালকন্যার প্রভাবে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের সমস্ত বিষয়গুলি বিস্বাদ হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হৃদয়ে কামবাসনা থাকার ফলে, রাজা পুরঞ্জন সর্বতোভাবে অত্যন্ত

দরিদ্র হয়ে যান। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি তা তিনি বুঝতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পত্নী ও পুত্রদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল হওয়ার ফলে, তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে অবিকল বর্তমান সভ্যতার পরিস্থিতি। সকলেই তার দেহ, গেহ ও পরিবার-পরিজন প্রতিপালনে ব্যস্ত। তার ফলে সকলেই জীবনের অন্তিম সময়ে, আধ্যাত্মিক জীবন কি এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি, সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়ার ফলে, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যেই সভ্যতার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখভোগ, সেখানে আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন সম্ভব নয়, কারণ মানুষ কেবল তাদের বর্তমান জীবন সম্বন্ধেই চিন্তা করে। জন্মান্তর যদিও বাস্তব সত্য, তবুও সেই সম্বন্ধে তাদের কোন তত্ত্ব প্রদান করা হয় না।

শ্লোক ১০

গন্ধর্বযবনাক্রান্তাং কালকন্যোপমর্দিতাম্ ।
হাতুং প্রচক্রমে রাজা তাং পুরীমনিকামতঃ ॥ ১০ ॥

গন্ধর্ব—গন্ধর্ব সৈনিকদের দ্বারা; **যবন**—এবং যবন সৈনিকদের দ্বারা; **আক্রান্তাম্**—আক্রান্ত হয়ে; **কাল-কন্যা**—কালকন্যার দ্বারা; **উপমর্দিতাম্**—বিধ্বস্ত হয়ে; **হাতুম্**—পরিত্যাগ করতে; **প্রচক্রমে**—প্রস্তুত হয়েছিলেন; **রাজা**—রাজা পুরঞ্জন; **তাম্**—সেই; **পুরীম্**—নগরী; **অনিকামতঃ**—অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

অনুবাদ

গন্ধর্ব ও যবন সৈনিকদের দ্বারা পুরঞ্জনের নগরী বিধ্বস্ত হয়েছিল, এবং সেই নগরী পরিত্যাগ করার বাসনা না থাকলেও, পরিস্থিতিবশত তাঁকে তা করতে হয়েছিল, কারণ তা কালকন্যার দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

জীব ভগবদ্বিমুখ হয়ে এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে কীটাণু পর্যন্ত কোন একটি বিশেষ শরীরের মাধ্যমে তাকে এই জগৎ ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। *বেদে* সৃষ্টির ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রথম সৃষ্ট জীব হচ্ছেন ব্রহ্মা, যিনি প্রজা বৃদ্ধির জন্য সপ্তর্ষি এবং অন্যান্য প্রজাপতিদের সৃষ্টি করেছিলেন। এইভাবে প্রতিটি জীব তার কর্ম ও বাসনা অনুসারে

বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, যা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পুরীষের কীট পর্যন্ত হতে পারে। বিশেষ প্রকার শরীরের সঙ্গে দীর্ঘকালের সঙ্গের প্রভাবে এবং কালকন্যা ও তার মায়ার কৃপায় জীব জড় শরীরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, যদিও প্রকৃতপক্ষে এই শরীরটি হচ্ছে দুঃখভোগের স্থান। কেউ যদি একটি পুরীষের কীটকে পুরীষ থেকে আলাদা করতে চায়, তা হলেও কীটটি কিছুতেই তা ছেড়ে যেতে চায় না। সে আবার পুরীষে ফিরে আসে। তেমনই, শূকর সাধারণত অত্যন্ত নোংরা স্থানে থাকে, বিষ্ঠা আহার করে, কিন্তু কেউ সেই অবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে এনে খুব সুন্দর কোন স্থানে থাকতে দেয়, শূকরটি কিন্তু তাতে রাজি হয় না। এইভাবে আমরা যদি প্রতিটি জীবকে পরীক্ষা করি, তা হলে আমরা দেখতে পাব যে, সে অধিকতর আরামদায়ক পরিস্থিতিতে থাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। যদিও রাজা পুরঞ্জন চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি সেই নগরী ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জীব যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার দেহটি সে ত্যাগ করতে চায় না। কিন্তু তা হলেও তাকে দেহত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়, কারণ এই জড় দেহটি চিরস্থায়ী নয়।

জীব বিভিন্নভাবে এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, এবং তাই প্রকৃতির নিয়মে তাকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, ঠিক যেভাবে মানুষ একটি শিশুর শরীর থেকে বালকের শরীর প্রাপ্ত হয়, বালকের শরীর থেকে যুবকের শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং যুবকের শরীর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের শরীর প্রাপ্ত হয়। এই পন্থা নিরন্তর চলছে। অন্তিম অবস্থায় যখন শরীর বৃদ্ধ ও অক্ষম হয়ে যায়, তখনও দেহটি ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হলেও জীব তা ত্যাগ করতে চায় না। জড় অস্তিত্ব এবং জড় দেহ যদিও আরামদায়ক নয়, তবুও জীব কেন তা ত্যাগ করতে চায় না? জড় দেহ পাওয়া মাত্রই জীবকে তা পালন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন এবং যে কার্যেই লিপ্ত থাকুক না কেন, তার জড় দেহটি পালন করার জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান মানব-সমাজে আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধে কারোরই কোন জ্ঞান নেই। যেহেতু জীব সৎ-চিৎ-আনন্দময় ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার প্রত্যাশী নয়, তাই সে তার বর্তমান শরীরটিকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, যদিও তা সম্পূর্ণরূপে অকেজো। তাই এই জড় জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ জনকল্যাণমূলক কার্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার করা।

এই আন্দোলন মানুষকে ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব প্রদান করছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন, এবং তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে সকলেই নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দময়

জীবন যাপন করতে পারেন। কৃষ্ণভক্ত দেহত্যাগ করতে ভয় করেন না, কারণ তিনি জানেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি নিত্য। কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি চিরকাল ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত; তাই যতদিন তিনি তাঁর বর্তমান শরীরে থাকেন, ততদিন তিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে সুখী থাকেন, এবং যখন তিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করেন, তখনও তিনি স্থায়ীভাবে ভগবানের সেবায় নিরন্তর যুক্ত থাকেন। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই মুক্ত। কিন্তু কর্মীরা, যাদের আধ্যাত্মিক জীবন বা ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা তাদের পচা জড় দেহটি ত্যাগ করার ভয়ে অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হয়।

শ্লোক ১১

ভয়নাম্নোঽগ্রজো ভ্রাতা প্রজ্বারঃ প্রত্যুপস্থিতঃ ।
দদাহ তাং পুরীং কৃৎস্নাং ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ১১ ॥

ভয়-নাম্নঃ—ভয় নামক; **অগ্র-জঃ**—জ্যেষ্ঠ; **ভ্রাতা**—ভাই; **প্রজ্বারঃ**—প্রজ্বার নামক; **প্রত্যুপস্থিতঃ**—সেখানে উপস্থিত হয়ে; **দদাহ**—আগুন জ্বালিয়েছিল; **তাম্**—সেই; **পুরীম্**—নগরীতে; **কৃৎস্নাম্**—সম্পূর্ণরূপে; **ভ্রাতুঃ**—তার ভ্রাতা; **প্রিয়-চিকীর্ষয়া**—প্রসন্ন করার জন্য।

অনুবাদ

তখন ভয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রজ্বার তার ভ্রাতার প্রসন্নতা বিধানের জন্য সেই নগরীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথায়, মৃত দেহ দহন করা হয়, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে দেহে আর এক প্রকার আগুন লাগে, যা হচ্ছে *প্রজ্বার* বা *বিষ্ণুজ্বার* নামক জ্বর। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বারা দেখা গেছে যে, দেহের তাপমাত্রা যখন ১০৭ডিগ্রীতে পৌঁছায়, তখন মানুষের মৃত্যু হয়। জীবনের অন্তিম সময়ে, এই প্রজ্বার জীবকে এক জ্বলন্ত অগ্নিতে স্থাপন করে।

শ্লোক ১২

তস্যাং সন্দহ্যমানায়াং সপৌরঃ সপরিচ্ছদঃ ।
কৌটুম্বিকঃ কুটুম্বিন্যা উপাতপ্যত সান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

তস্যাম্—সেই নগরীটি যখন; **সন্দহ্যমানায়াম্**—দগ্ধ হচ্ছিল; **স-পৌরঃ**—সমস্ত পুরবাসীগণ সহ; **স-পরিচ্ছদঃ**—সমস্ত অনুগামী এবং ভৃত্যগণ সহ; **কৌটুম্বিকঃ**—বহু আত্মীয়স্বজন সমন্বিত রাজা; **কুটুম্বিন্যা**—তাঁর পত্নীসহ; **উপাতপ্যত**—সেই অগ্নির তাপে দগ্ধ হতে লাগল; **স-অন্বয়ঃ**—তাঁর বংশধরগণ সহ।

অনুবাদ

সেই নগরী যখন দগ্ধ হচ্ছিল, তখন সমস্ত নাগরিকেরা, রাজার ভৃত্যরা, আত্মীয়-স্বজনেরা, পুত্র, পৌত্র, পত্নী এবং অন্যান্য কুটুম্বগণ সেই আগুনে দগ্ধ হতে লাগল। রাজা পুরঞ্জন তার ফলে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শরীরের অনেক অঙ্গ রয়েছে—ইন্দ্রিয়, হাত, পা, ত্বক, মাংসপেশী, রক্ত, মজ্জা, ইত্যাদি—এবং সেগুলিকে এখানে আলংকারিকভাবে পুত্র, পৌত্র, নাগরিক, অনুচরবর্গ, ইত্যাদিরূপে দর্শন করা হয়েছে। দেহ যখন *বিষ্ণুজ্বারের* দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সেই প্রচণ্ড তাপের ফলে, কখনও কখনও মানুষ মূর্চ্ছিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, দেহ তখন এত প্রবল বেদনা অনুভব করে যে, মানুষ অচেতন হয়ে যায় এবং তার দেহের কষ্ট অনুভব করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর সময় জীব এতই অসহায় হয়ে যায় যে, তার ইচ্ছা না থাকলেও তাকে দেহত্যাগ করে আর একটি দেহে প্রবেশ করতে বাধ্য করা হয়। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা মানুষ সাময়িকভাবে জীবনের পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করতে পারে, কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দুঃখ থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। এগুলি জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে ভগবান নিয়ন্ত্রণ করেন। মূর্খ মানুষেরা এই সরল সত্যটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। মানুষেরা এখন সমুদ্রের তলদেশে পেট্রোলের অনুসন্ধানের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। তারা ভবিষ্যতের পেট্রোল সাপ্লাই সম্বন্ধে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দুঃখ থেকে তারা নিবৃত্তি লাভ করতে পারে না। এইভাবে অজ্ঞতাবশত যারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তাদের সমস্ত কার্যকলাপই ব্যর্থ।

শ্লোক ১৩

যবনোপরুদ্ধায়তনো গ্রস্তায়াং কালকন্যয়া ।
পুর্যাং প্রজ্বারসংসৃষ্টঃ পুরপালোঽন্বতপ্যত ॥ ১৩ ॥

যবন—যবনদের দ্বারা; **উপরুদ্ধ**—আক্রান্ত; **আয়তনঃ**—তার আবাস; **গ্রস্তায়াম্**—যখন অধিকৃত হয়েছিল; **কাল-কন্যয়া**—কালকন্যার দ্বারা; **পুর্যাম্**—নগরী; **প্রজ্বার-সংসৃষ্টঃ**—প্রজ্বার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে; **পুর-পালঃ**—নগরাধ্যক্ষ; **অন্বতপ্যত**—অত্যন্ত শোককাতর হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই নগরীর রক্ষক সর্পটি যখন দেখল যে, নাগরিকেরা কালকন্যার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, এবং যবনেরা তার গৃহে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, তখন অত্যন্ত শোকে সে কাতর হয়ে পড়েছিল।

তাৎপর্য

জীব দুই প্রকার শরীরের দ্বারা আবৃত—স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম দেহ। মৃত্যুর সময় স্থূল শরীর নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা বাহিত হয়ে জীব আর একটি স্থূল শরীরে প্রবেশ করে। আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারে না, কিভাবে সূক্ষ্ম শরীর আত্মাকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে বহন করে নিয়ে যায়। সূক্ষ্ম দেহকে এখানে একটি সর্প বা নগর-রক্ষকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন নগরীর সর্বত্র আগুন লাগে, তখন প্রধান নগর-রক্ষকও তা থেকে রক্ষা পায় না। যখন নগর সুরক্ষিত থাকে এবং সারা নগরী জুড়ে আগুন লাগার মতো সংকট থাকে না, তখন নগর-রক্ষক নাগরিকদের উপর তার অধিকার বিস্তার করতে পারে, কিন্তু যখন নগর চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়, তখন সে সর্বতোভাবে অক্ষম হয়ে যায়। প্রাণবায়ু যখন দেহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন সূক্ষ্ম শরীরও বেদনা অনুভব করতে থাকে।

শ্লোক ১৪

ন শেকে সোঽবিতুং তত্র পুরুকৃচ্ছ্রোরুবেপথুঃ ।
গন্তুমৈচ্ছত্ততো বৃক্ষকোটরাদিব সানলাৎ ॥ ১৪ ॥

ন—না; **শেকে**—সক্ষম হয়েছিল; **সঃ**—তিনি; **অবিতুম্**—রক্ষা করতে; **তত্র**—সেখানে; **পুরু**—অত্যন্ত; **কৃচ্ছ্র**—ক্লেশ; **উরু**—অত্যন্ত; **বেপথুঃ**—কম্প; **গন্তুম্**—বেরিয়ে যাওয়ার জন্য; **ঐচ্ছৎ**—বাসনা করেছিল; **ততঃ**—সেখান থেকে; **বৃক্ষ**—বৃক্ষের; **কোটরাৎ**—কোটর থেকে; **ইব**—সদৃশ; **স-অনলাৎ**—অগ্নিতে।

অনুবাদ

বনে আগুন লাগলে বৃক্ষের কোটরস্থ সর্প যেমন সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা করে, তেমনই নগরীর অধ্যক্ষ সর্পটিও অগ্নির প্রচণ্ড তাপের ফলে, সেই নগরী ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল।

তাৎপর্য

বনে যখন আগুন লাগে, তখন সাপেদের পক্ষে সেই বন থেকে বেরিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়। অন্যান্য পশুরা তাদের দীর্ঘ পায়ের সাহায্যে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু ভুজঙ্গ সাধারণত সেই আগুনে দগ্ধ হয়। জীবনের অন্তিম সময়ে, প্রাণবায়ু যেভাবে প্রভাবিত হয়, শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলি ততটা হয় না।

শ্লোক ১৫

শিথিলাবয়বো যর্হি গন্ধর্বৈর্হৃতপৌরুষঃ ।
যবনৈররিভী রাজন্নুপরুদ্ধো রুরোদ হ ॥ ১৫ ॥

শিথিল—শিথিল; **অবয়বঃ**—তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; **যর্হি**—যখন; **গন্ধর্বৈঃ**—গন্ধর্বদের দ্বারা; **হৃত**—পরাজিত; **পৌরুষঃ**—তাঁর দৈহিক শক্তি; **যবনৈঃ**—যবনদের দ্বারা; **অরিভিঃ**—শত্রুদের দ্বারা; **রাজন্**—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ; **উপরুদ্ধঃ**—রুদ্ধ হওয়ায়; **রুরোদ**—উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে থাকে; **হ**—বাস্তবিকপক্ষে।

অনুবাদ

যখন গন্ধর্ব ও যবন সৈনিকেরা তাঁর দেহের শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে ফেলছিল, তখন সেই সর্পটির শরীর শিথিল হয়ে গিয়েছিল। সে যখন তার দেহটি ত্যাগ করার চেষ্টা করে, তখন তার শত্রুরা তাকে আটকে ফেলে। এইভাবে তার সমস্ত প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়েছিল, তখন সে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল।

তাৎপর্য

জীবনের অন্তিম সময়ে ব্যাধির প্রভাবে, কফ, পিত্ত ও বায়ুর দ্বারা শরীরের বিভিন্ন দ্বারগুলি রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন জীব তার কষ্ট ব্যক্ত করতে পারে না, এবং তার

চারপাশে দণ্ডায়মান আত্মীয়-স্বজনেরা মৃত্যু-পথযাত্রী ব্যক্তির কণ্ঠ থেকে 'ঘুর্‌ঘুর্' শব্দ শুনতে পায়। *মুকুন্দমালা-স্তোত্রে* রাজা কুলশেখর বর্ণনা করেছেন—

কৃষ্ণ! ত্বদীয়-পদপঙ্কজপঞ্জরান্তম্
অদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥

"হে কৃষ্ণ! আমাকে এখনই মৃত্যুবরণ করতে দাও, যাতে আমার মনরূপী হংস তোমার চরণ-কমলের নালের দ্বারা আলিঙ্গিত হতে পারে। তা না হলে, প্রাণত্যাগ করার সময় যখন আমার কণ্ঠ কফ, বায়ু ও পিত্তের দ্বারা রুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন আমি কিভাবে তোমার কথা চিন্তা করব?" হংস গভীর জলে ডুব দিয়ে কমল-নালের দ্বারা বেষ্টিত হতে খুব ভালবাসে। এই বন্ধন তার এক প্রকার আনন্দ বিলাস। আমরা যদি সুস্থ অবস্থায় ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে মৃত্যুবরণ করতে পারি, তা হলে সেটি সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য। বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর সময়, কণ্ঠ কখনও কখনও কফ অথবা বায়ুর দ্বারা রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তার ফলে সে কৃষ্ণকে ভুলে যেতে পারে। অবশ্য যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় সুদৃঢ়ভাবে অবস্থিত, তাঁদের পক্ষে কোন অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ তাঁরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে অভ্যস্ত, বিশেষ করে যখন মৃত্যুর সংকেত আসে।

শ্লোক ১৬

দুহিতৃঃ পুত্রপৌত্রাংশ্চ জামিজামাতৃপার্ষদান্ ।
স্বত্বাবশিষ্টং যৎকিঞ্চিদ্ গৃহকোশপরিচ্ছদম্ ॥ ১৬ ॥

দুহিতৃঃ—কন্যা; **পুত্র**—পুত্র; **পৌত্রান্**—পৌত্র; **চ**—এবং; **জামি**—পুত্রবধূ; **জামাতৃ**—জামাতা; **পার্ষদান্**—পার্ষদ; **স্বত্ব**—সম্পত্তি; **অবশিষ্টম্**—অবশিষ্ট; **যৎ কিঞ্চিৎ**—যা কিছু; **গৃহ**—গৃহ; **কোশ**—সঞ্চিত ধন; **পরিচ্ছদম্**—গৃহের উপকরণ।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন তখন তাঁর কন্যা, পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধূ, জামাতা, ভৃত্য, অন্যান্য পার্ষদ, গৃহ, গৃহের উপকরণ এবং যৎসামান্য সঞ্চিত ধন-সম্পদের কথা চিন্তা করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

প্রায়ই দেখা যায় যে, জড় দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুর সময় ডাক্তারের কাছে অনুরোধ করে, আর কিছুক্ষণের জন্য তাকে বাঁচিয়ে রাখতে। তথাকথিত ডাক্তারেরা অক্সিজেন বা অন্যান্য ওষুধের সাহায্যে কয়েক মিনিটের জন্য যদি রোগীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, তা হলে তারা তাদের সেই প্রচেষ্টাকে সার্থক বলে মনে করে, কিন্তু চরমে রোগীকে মৃত্যুবরণ করতেই হয়। একে বলা হয় জীবন-সংগ্রাম। মৃত্যুর সময় রোগী ও ডাক্তার দুজনেই জীবনের মেয়াদ বৃদ্ধি করার কথা চিন্তা করে, যদিও দেহটি প্রায় মরে গেছে এবং আত্মা তা থেকে প্রায় বেরিয়ে গেছে।

শ্লোক ১৭

অহং মমেতি স্বীকৃত্য গৃহেষু কুমতির্গৃহী ।
দধ্যৌ প্রমদয়া দীনো বিপ্রয়োগ উপস্থিতে ॥ ১৭ ॥

অহম্—আমি; **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে; **স্বী-কৃত্য**—স্বীকার করে; **গৃহেষু**—গৃহে; **কু-মতিঃ**—যার মন কদর্য চিন্তায় পূর্ণ; **গৃহী**—গৃহস্থ; **দধ্যৌ**—চিন্তা করে; **প্রমদয়া**—তাঁর পত্নীর সঙ্গে; **দীনঃ**—অত্যন্ত দরিদ্র; **বিপ্রয়োগে**—যখন বিচ্ছেদ; **উপস্থিতে**—উপস্থিত হলে।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন তাঁর পরিবার এবং 'আমি' ও 'আমার' ধারণার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। যেহেতু তিনি তাঁর পত্নীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, তাই তিনি ইতিপূর্বেই অত্যন্ত দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এখন তার সঙ্গে বিচ্ছেদের সময় উপস্থিত হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মৃত্যুর সময়েও মনে জড় সুখভোগের চিন্তা থাকে। তা ইঙ্গিত করে যে, মন, বুদ্ধি ও অহংকার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম দেহ আত্মাকে বহন করে নিয়ে যায়। অহংকারের ফলে জীব জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, এবং জড় সুখভোগের অভাবে সে অত্যন্ত বিষণ্ণ অথবা কাতর হয়ে পড়ে। সে তার বুদ্ধি দিয়ে পরিকল্পনা করে, কিভাবে তার আয়ু বাড়ানো যায়, এবং তাই

স্থূল শরীর পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও, সে তার সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা অন্য আর একটি স্থূল শরীরে বাহিত হয়। জড় চক্ষুর দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের দেহান্তর দেখা যায় না; তাই কেউ যখন তার স্থূল দেহটি ত্যাগ করে, তখন আমরা মনে করি যে, তার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। জড় সুখভোগের পরিকল্পনাগুলি করে সূক্ষ্ম দেহ, এবং স্থূল দেহ হচ্ছে সেই পরিকল্পনাগুলি উপভোগ করার যন্ত্র। সেই সূত্রে স্থূল দেহকে পত্নীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, কারণ পত্নী হচ্ছে পতির সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রধান সহায়ক। স্থূল দেহের সঙ্গে দীর্ঘকাল যাবৎ সম্পর্ক থাকার ফলে, জীব তার বিচ্ছেদে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে। জীবের মানসিক কার্যকলাপ তাকে অন্য আর একটি স্থূল দেহ ধারণ করে তার জড়-জাগতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে বাধ্য করে।

সংস্কৃত ভাষায় *স্ত্রী* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিস্তার'। স্ত্রীর মাধ্যমে মানুষ পুত্র, কন্যা, পৌত্র ইত্যাদি আকর্ষণের বস্তুগুলি বিস্তার করে। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি আসক্তি মৃত্যুর সময় অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রকট হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, দেহত্যাগ করার ঠিক পূর্বে মানুষ তার প্রিয় পুত্রকে ডেকে তার হাতে তার পত্নী এবং অন্যান্য বস্তুর দায়িত্বভার অর্পণ করে। সে বলে, "প্রিয় পুত্র! আমি তো এখন চলে যেতে বাধ্য হচ্ছি। দয়া করে তুমি পরিবারের দায়দায়িত্ব গ্রহণ কর।" সে যে কোথায় যাচ্ছে সেই সম্বন্ধে কিছুই না জেনে, সে এইভাবে বলে।

শ্লোক ১৮

লোকান্তরং গতবতি ময্যনাথা কুটুম্বিনী ।
বর্তিষ্যতে কথং ত্বেষা বালকাননুশোচতী ॥ ১৮ ॥

লোক-অন্তরম্—অন্য জীবনে; **গতবতি ময়ি**—আমি চলে গেলে; **অনাথা**—পতিবিহীনা; **কুটুম্বিনী**—আত্মীয়স্বজন পরিবৃতা; **বর্তিষ্যতে**—অবস্থান করবে; **কথম্**—কিভাবে; **তু**—তখন; **এষা**—এই নারী; **বালকান্**—শিশুদের; **অনুশোচতী**—শোক করতে করতে।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন, "হায়, আমার পত্নী এতগুলি সন্তানের ভারে ভারাক্রান্ত। আমি দেহত্যাগ করে অন্য লোকে চলে গেলে, সে কিভাবে পরিবারের এই সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের পালন করবে? হায়! পরিবার প্রতিপালনের দুশ্চিন্তায় সে না জানি কত কষ্ট পাবে।"

তাৎপর্য

তাঁর পত্নীর বিষয়ে তাঁর এত চিন্তা দেখে বোঝা যায় যে, রাজা স্ত্রীলোকদের চিন্তায় অত্যন্ত মগ্ন ছিলেন। সাধারণত সতী নারী অত্যন্ত পতিব্রতা পত্নী হন। তার ফলে পতি তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েন, এবং পরিণামে মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর পত্নীর কথা অত্যধিক চিন্তা করেন। এটি একটি অত্যন্ত ভয়ংকর পরিস্থিতি, যা রাজা পুরঞ্জনের জীবন থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কেউ যদি মৃত্যুর সময় শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে না গিয়ে, একটি স্ত্রী-শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে, আর একটি জড়-জাগতিক জীবন যাপনের নতুন অধ্যায় শুরু করবেন।

শ্লোক ১৯

ন ময্যনাশিতে ভুঙ্‌ক্তে নাস্নাতে স্নাতি মৎপরা ।
ময়ি রুষ্টে সুসন্ত্রস্তা ভর্ৎসিতে যতবাগ্‌ভয়াৎ ॥ ১৯ ॥

ন—কখনই না; **ময়ি**—যখন আমি; **অনাশিতে**—আহার না করলে; **ভুঙ্‌ক্তে**—সে ভোজন করত; **ন**—কখনই না; **অস্নাতে**—আমি স্নান না করলে; **স্নাতি**—সে স্নান করত; **মৎ-পরা**—সর্বদা আমার প্রতি অনুরক্ত; **ময়ি**—আমি যখন; **রুষ্টে**—ক্রুদ্ধ হতাম; **সু-সন্ত্রস্তা**—অত্যন্ত ভীত হত; **ভর্ৎসিতে**—আমি যখন তাকে ভর্ৎসনা করতাম; **যত-বাক্**—পূর্ণরূপে বাণী সংযত করে; **ভয়াৎ**—ভয়বশত।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নীর সঙ্গে তাঁর পূর্ব আচরণের কথা মনে করতে লাগলেন। রাজা ভাবতে লাগলেন—"আমি আহার না করা পর্যন্ত সে আহার করত না, আমি স্নান না করা পর্যন্ত সে স্নান করত না, এবং সে আমার প্রতি এতই অনুরক্ত ছিল যে, কখনও কখনও আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করলে, সে নীরবে আমার সেই দুর্ব্যবহার সহ্য করত।"

তাৎপর্য

পত্নীর কর্তব্য সর্বদা পতির প্রতি বিনম্র থাকা। বিনম্রতা, মৃদু ব্যবহার এবং আনুগত্য হচ্ছে পত্নীর গুণ, যা পতিকে তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তাশীল করে তোলে। পারিবারিক জীবনে পত্নীর প্রতি পতির আসক্তি খুব ভাল লক্ষণ, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তা ভাল নয়। তাই প্রতিটি গৃহে কৃষ্ণভক্তির প্রতিষ্ঠা

হওয়া অবশ্য কর্তব্য। যদি পতি ও পত্নী কৃষ্ণভক্তিতে পরস্পরের প্রতি আসক্ত থাকে, তা হলে তাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে শ্রীকৃষ্ণ থাকার ফলে, তাঁরা উভয়েই লাভবান হবেন। তা না হলে, পতি যদি তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন, তা হলে তাঁকে তাঁর পরবর্তী জীবনে স্ত্রী-শরীরে জন্মগ্রহণ করতে হবে। স্ত্রী যদি তাঁর পতির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকেন, তা হলে তিনি তাঁর পরবর্তী জীবনে পুরুষ-শরীর প্রাপ্ত হবেন। স্ত্রীর পক্ষে অবশ্য পুরুষ হয়ে জন্মানো লাভজনক, কিন্তু পুরুষের স্ত্রী-শরীর লাভ করাটা মোটেই লাভজনক নয়।

শ্লোক ২০

প্রবোধয়তি মাবিজ্ঞং ব্যুষিতে শোককর্শিতা ।
বর্ত্মৈতদ্ গৃহমেধীয়ং বীরসূরপি নেষ্যতি ॥ ২০ ॥

প্রবোধয়তি—সৎ পরামর্শ দেয়; **মা**—আমাকে; **অবিজ্ঞম্**—মূর্খ; **ব্যুষিতে**—আমি বাইরে গেলে; **শোক**—শোকের দ্বারা; **কর্শিতা**—শোকের ফলে ম্রিয়মাণ; **বর্ত্ম**—পথ; **এতৎ**—এই; **গৃহ-মেধীয়ম্**—গৃহের দায়দায়িত্ব; **বীর-সূঃ**—বীরদের জননী; **অপি**—যদিও; **নেষ্যতি**—সে কি সম্পাদন করতে সক্ষম হবে।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন ভাবতে লাগলেন—"আমি যখন মোহাচ্ছন্ন হতাম, তখন আমার পত্নী কিভাবে আমাকে সৎ পরামর্শ প্রদান করত এবং আমি গৃহ থেকে বাইরে চলে গেলে, সে অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হত। যদিও সে বহু সন্তানের জননী, তবুও আমার আশঙ্কা এই যে, গৃহস্থালির দায়-দায়িত্বগুলি বহন করতে সে কি সক্ষম হবে?"

তাৎপর্য

মৃত্যুর সময় রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা করছিলেন। তাকে বলা হয় কলুষিত চেতনা। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) বিশ্লেষণ করেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে যত জীব রয়েছে, তারা সকলেই আমার শাশ্বত বিভিন্ন অংশ। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে, তারা মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কঠোর সংগ্রাম করছে।"

জীব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং জীবের স্বরূপ গুণগতভাবে এক। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে, জীব নিত্যকাল ভগবানের অণুসদৃশ অংশ। *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।* এই জড় জগতের বদ্ধ জীবনে, ভগবানের অণুসদৃশ অংশ জীবাত্মা তার কলুষিত মন এবং চেতনার দরুন সংগ্রাম করছে। পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে জীবের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণের কথা চিন্তা করা, কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, রাজা পুরঞ্জন (জীব) একজন স্ত্রীর কথা চিন্তা করছেন। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে এইভাবে মগ্ন হওয়ার ফলে, জীব এই জড় জগতে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। রাজা পুরঞ্জন যেহেতু তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা করছিলেন, তাই তাঁর মৃত্যুতে এই জড় জগতে তাঁর সংগ্রাম সমাপ্ত হবে না। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে যে, তাঁর পত্নীর চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, রাজা পুরঞ্জনকে তাঁর পরবর্তী জীবনে একটি স্ত্রী-শরীর গ্রহণ করতে হয়েছিল। এইভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক, কপট-ধর্ম, জাতি এবং সাম্প্রদায়িক চেতনাই বন্ধনের কারণ হয়। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষকে এই জীবনেই তার কার্যকলাপের পরিবর্তন করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) তা প্রতিপন্ন হয়েছে। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মনোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।* আমরা যদি এই জীবনে আমাদের চেতনার পরিবর্তন সাধন না করি, তা হলে সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম অথবা সম্প্রদায় এবং জাতির কল্যাণ-সাধনের নামে আমরা যা-ই করি, তা সবই আমাদের বন্ধনের কারণ হবে। অর্থাৎ আমাদের এই জড় জগতে বদ্ধ জীবন চলতে থাকবে। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) সেই সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, *মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।* মন ও ইন্দ্রিয়গুলি যখন জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, তখন সুখলাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। প্রতিটি জীবনেই জীব সুখী হওয়ার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে কেউই সুখী নয়। কিন্তু এই সংগ্রাম তাকে সুখের ভ্রান্ত অনুভূতি প্রদান করে। মানুষকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, এবং সে যখন তার সেই কঠোর পরিশ্রমের ফল লাভ করে, তখন সে নিজেকে সুখী বলে মনে করে। প্রকৃত সুখ যে কি তা এই জড় জগতে কেউই জানে না। *সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্* (*ভগবদ্গীতা* ৬/২১)। প্রকৃত সুখ অনুভব করতে হয় দিব্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। পবিত্র না হলে, দিব্য ইন্দ্রিয়গুলি প্রকাশিত হয় না; তাই ইন্দ্রিয়গুলিকে পবিত্র করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করে, ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হয়। তখন প্রকৃত সুখ এবং মুক্তিলাভ হবে।

ভগবদ্গীতায় (১৫/৮) বলা হয়েছে—

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥

"এই জড় জগতে জীব এক দেহ থেকে আর এক দেহে তার জীবনের বিভিন্ন ধারণা বহন করে, ঠিক যেভাবে বায়ু গন্ধ বহন করে।" গোলাপ বাগিচার উপর দিয়ে যখন বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন সেই বায়ু গোলাপের গন্ধ বহন করে নিয়ে যায়, এবং তা যদি নোংরা স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তা নানা রকম কদর্য বস্তুর দুর্গন্ধ বহন করে। তেমনই, রাজা পুরঞ্জন বা জীব তাঁর জীবনের বায়ু তাঁর পত্নীর উপর দিয়ে প্রবাহিত করছিলেন; তাই তাঁকে তাঁর পরবর্তী জীবনে একটি স্ত্রী-শরীর ধারণ করতে হয়েছিল।

শ্লোক ২১

কথং নু দারকা দীনা দারকীর্বাপরায়ণাঃ ।
বর্তিষ্যন্তে ময়ি গতে ভিন্ননাব ইবোদধৌ ॥ ২১ ॥

কথম্—কিভাবে; **নু**—প্রকৃতপক্ষে; **দারকাঃ**—পুত্রগণ; **দীনাঃ**—অসহায়; **দারকীঃ**—কন্যাগণ; **বা**—অথবা ; **অপরায়ণাঃ**—নিরাশ্রয়; **বর্তিষ্যন্তে**—জীবন ধারণ করবে; **ময়ি**—আমি যখন ; **গতে**—এই পৃথিবী থেকে চলে গেলে; **ভিন্ন**—ভগ্ন; **নাবঃ**—নৌকা; **ইব**—সদৃশ; **উদধৌ**—সমুদ্রে।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন দুশ্চিন্তা করতে লাগলেন—"আমি পরলোকে গমন করলে, সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভরশীল আমার পুত্র ও কন্যারা কিভাবে জীবন ধারণ করবে? মাঝসমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হলে আরোহীদের যে অবস্থা হয়, তাদের অবস্থাও ঠিক সেই রকম হবে।"

তাৎপর্য

মৃত্যুর সময় প্রতিটি জীবই চিন্তা করে, তার পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের কি হবে। তেমনই রাজনীতিবিদেরাও চিন্তা করে, তাদের মৃত্যু হলে, তাদের দেশের এবং রাজনৈতিক দলের কি অবস্থা হবে। পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় না হলে, তাকে তার

বিশেষ চেতনা অনুসারে, পরবর্তী জীবনে একটি বিশেষ দেহ ধারণ করতে হবে। যেহেতু পুরঞ্জন তাঁর পত্নী ও পুত্র-কন্যাদের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, বিশেষ করে তিনি তাঁর পত্নীর চিন্তায় অত্যন্ত মগ্ন ছিলেন, তাই তাঁকে পরবর্তী জীবনে একটি স্ত্রী-শরীর ধারণ করতে হবে। তেমনই রাজনীতিবিদ অথবা তথাকথিত জাতীয়তাবাদীরা, যারা তাদের জন্মভূমির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা অবশ্যই তাদের জীবনান্তে পুনরায় সেই দেশেই জন্মগ্রহণ করবে। মানুষের এই জীবনের কর্মের দ্বারা তার পরবর্তী জীবন প্রভাবিত হয়। কখনও কখনও রাজনীতিবিদেরা তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনের জন্য অত্যন্ত জঘন্য পাপকর্ম করে। বিরোধী দলের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। রাজনীতিবিদেরা যদি তাদের তথাকথিত মাতৃভূমিতে জন্মগ্রহণ করেও, তবুও তাদের পূর্বজন্মের পাপকর্মের ফলে, তাদের নানা প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়।

দেহান্তরের এই বিজ্ঞান আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে চায় না, কারণ তারা যদি এই সূক্ষ্ম বিষয়টি এবং জীবনের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করে, তা হলে তারা দেখতে পাবে যে, তাদের ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই তারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সমস্ত বিবেচনা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আবশ্যকতার নামে সব সময় পাপকর্ম করতে থাকে।

শ্লোক ২২

এবং কৃপণয়া বুদ্ধ্যা শোচন্তমতদর্হণম্ ।
গ্রহীতুং কৃতধীরেনং ভয়নামাভ্যপদ্যত ॥ ২২ ॥

এবম্—এইভাবে; **কৃপণয়া**—কার্পণ্যের দ্বারা; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধি; **শোচন্তম্**—শোক করে; **অ-তৎ-অর্হণম্**—যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়; **গ্রহীতুম্**—গ্রেফতার করার জন্য; **কৃত-ধীঃ**—দৃঢ়সংকল্প যবনরাজ; **এনম্**—তাঁকে; **ভয়-নামা**—ভয় নামক; **অভ্য-পদ্যত**—তৎক্ষণাৎ সেখানে এসেছিলেন।

অনুবাদ

যদিও পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাজা পুরঞ্জনের শোক করা উচিত ছিল না, তবুও তাঁর দীন বুদ্ধির ফলে তিনি তা করেছিলেন। সেই সময় ভয় নামক যবনরাজ তাঁকে বন্দি করার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

মূর্খ মানুষেরা জানে না যে, প্রতিটি জীবাত্মা তার কর্ম ও ফলের জন্য দায়ী। শিশু অথবা বালক অবস্থায় জীব যখন অবোধ থাকে, তখন পিতামাতার কর্তব্য হচ্ছে তাকে জীবনের মূল্য সম্বন্ধে যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া। শিশু যখন বড় হয়ে যায়, তখন তার জীবনের কর্তব্যগুলি যথাযথভাবে সম্পাদন করার দায়িত্ব তার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। পিতামাতার মৃত্যুর পর, তাঁদের সন্তানদের সাহায্য করতে পারেন না। সন্তানদের সাময়িক সাহায্যের জন্য পিতা কিছু সম্পত্তি রেখে যেতে পারেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পরিবারের ভরণপোষণ কিভাবে হবে, সেই চিন্তায় মগ্ন থাকা উচিত নয়। এটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবের রোগ। সে কেবল তার নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্যই পাপকর্ম করে না, তার সন্তান-সন্ততিরা যাতে মহা আড়ম্বরে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে পারে, সেই জন্যও প্রচুর ধনসম্পদ রেখে যেতে চায়।

সে যাই হোক, সকলেই মৃত্যুর ভয়ে ভীত, এবং তাই মৃত্যুকে বলা হয় *ভয়*। পুরঞ্জন যদিও তাঁর পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তবুও মৃত্যু তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করেনি। মৃত্যু কারোরই জন্য প্রতীক্ষা করে না; সে তৎক্ষণাৎ তার কর্তব্য সম্পাদন করে। মৃত্যু যেহেতু নির্দ্বিধায় সমস্ত জীবদের এখান থেকে নিয়ে যাবে, তাই যে সমস্ত নাস্তিকেরা ভগবদ্ভক্তিকে অবহেলা করে তাদের দেশ, সমাজ, আত্মীয়-স্বজনদের চিন্তায় তাদের জীবনের অপচয় করে, তাদের কাছে মৃত্যুই হচ্ছে চরম ভগবৎ-উপলব্ধি। এই শ্লোকে *অতদ্-অর্হণম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তার অর্থ হচ্ছে, আত্মীয়স্বজন, দেশবাসী, সমাজ এবং জাতির কল্যাণজনক কার্যে অত্যধিক আগ্রহী হওয়া উচিত নয়। সেগুলি মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে সাহায্য করে না। দুর্ভাগ্যবশত এখন সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষদেরও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। যদিও মনুষ্য-জীবন লাভ করার ফলে তারা আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের সুযোগ পেয়েছে, তবুও তারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চায় না। ধন থাকা সত্ত্বেও যে সেই ধন ব্যবহার করে না, তাকে বলা হয় কৃপণ। তাই এই সমস্ত মানুষেরা হচ্ছে এক-একটি মস্ত বড় কৃপণ। তারা তাদের জীবনের অপব্যবহার করে, এবং তাদের আত্মীয়স্বজন, দেশবাসী, সমাজ ইত্যাদি জাগতিক কল্যাণের চিন্তায় মগ্ন থেকে মনুষ্য জীবনের অমূল্য সুযোগটির অপচয় করে। মানুষের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে কিভাবে মৃত্যুকে জয় করতে হয়, সেই শিক্ষা লাভ করা। মৃত্যুকে জয় করার পন্থা বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) উল্লেখ করেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন! যে ব্যক্তি জানেন যে, আমার আবির্ভাব এবং কার্যকলাপ অপ্রাকৃত, তিনি দেহত্যাগ করার পর, পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি আমার নিত্য ধাম প্রাপ্ত হন।"

যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়, তিনি এই দেহ ত্যাগ করার পর, পুনরায় আর একটি জড় শরীর ধারণ করেন না, পক্ষান্তরে তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। প্রত্যেকেরই এই পূর্ণতা লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত তা না করে, মানুষ তার সমাজ, বন্ধুবান্ধব, প্রিয়তমা এবং আত্মীয়-স্বজনদের চিন্তায় মগ্ন থাকে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষদের শিক্ষা দিচ্ছে, কিভাবে মৃত্যুকে জয় করতে হয়। *হরিং বিনা ন সৃতিং তরন্তি।* পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করলে, মৃত্যুকে জয় করা যায় না।

শ্লোক ২৩

পশুবদ্‌যবনৈরেষ নীয়মানঃ স্বকং ক্ষয়ম্ ।
অন্বদ্রবন্ননুপথাঃ শোচন্তো ভৃশমাতুরাঃ ॥ ২৩ ॥

পশু-বৎ—পশুর মতো; **যবনৈঃ**—যবনদের দ্বারা; **এষঃ**—পুরঞ্জন; **নীয়মানঃ**—বন্ধন করে নিয়ে গেল; **স্বকম্**—তাদের; **ক্ষয়ম্**—বাসস্থানে; **অন্বদ্রবন্**—পশ্চাদ্‌বর্তী হল; **অনুপথাঃ**—তাঁর অনুচরেরা; **শোচন্তঃ**—শোক করে; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **আতুরাঃ**—ব্যাকুল হয়ে।

অনুবাদ

যবনেরা যখন রাজা পুরঞ্জনকে একটি পশুর মতো বন্ধন করে তাঁকে তাদের স্থানে নিয়ে যেতে লাগল, তখন রাজার অনুচরেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। তারা যখন শোক করছিল, তখন তাদেরও তার সঙ্গে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

তাৎপর্য

যমরাজ ও যমদূতেরা যখন জীবকে যমালয়ে নিয়ে যান, তখন প্রাণ, বাসনা আদি জীবের অনুচরেরাও তার সঙ্গে যায়। সেই সত্য *বেদে* প্রতিপন্ন হয়েছে। যমরাজ

যখন জীবকে বন্দি করে নিয়ে যান (*তম্ উৎক্রামন্তম্*), প্রাণও তখন তার সঙ্গে যায় (*প্রাণোঽনূৎক্রামতি*), এবং প্রাণ যখন যায় (*প্রাণম্অনুৎক্রামন্তম্*), সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিও (*সর্বে প্রাণাঃ*) তার সঙ্গে যায় (*অনুৎক্রামন্তি*)। জীব এবং প্রাণবায়ু যখন চলে যায়, তখন মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূতের তৈরি জড় পিণ্ডটি এখানে পড়ে থাকে। জীব তখন বিচারের জন্য যমালয়ে যায়, এবং যমরাজ স্থির করেন সে তার পরবর্তী জীবনে কি প্রকার শরীর প্রাপ্ত হবে। এই পন্থাটি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে অজ্ঞাত। প্রতিটি জীবই এই জীবনে তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী, এবং মৃত্যুর পর তাকে যমালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে স্থির করা হয় তার পরবর্তী শরীরটি কি রকম হবে। তার স্থূল জড় দেহ ত্যাগ করলেও, তার বাসনা এবং বিগত কর্মের ফল জীবাত্মার সঙ্গে যায়। যমরাজ স্থির করেন জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে কি প্রকার শরীর প্রাপ্ত হবে।

শ্লোক ২৪

পুরীং বিহায়োপগতঃ উপরুদ্ধো ভুজঙ্গমঃ ।
যদা তমেবানু পুরী বিশীর্ণা প্রকৃতিং গতা ॥ ২৪ ॥

পুরীম্—নগরী; **বিহায়**—ত্যাগ করে; **উপগতঃ**—চলে গেলে; **উপরুদ্ধঃ**—অবরুদ্ধ; **ভুজঙ্গমঃ**—সর্প; **যদা**—যখন; **তম্**—তাকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনু**—পশ্চাৎ; **পুরী**—নগরী; **বিশীর্ণা**—বিধ্বস্ত; **প্রকৃতিম্**—পঞ্চভূতে; **গতা**—পরিণত হয়েছিল।

অনুবাদ

তখন সেই সর্পটিও, যাকে যবনরাজের সৈন্যরা বন্দি করে পূর্বেই নগরী থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল, অন্যদের সঙ্গে সেও তার প্রভুকে অনুসরণ করতে লাগল। তারা যখন সেই নগরীটি ত্যাগ করল, তখনই তা বিশীর্ণ হয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হল।

তাৎপর্য

জীবকে যখন যমদূতেরা বন্দি করে নিয়ে যায়, তখন প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় আদি তার অনুগামীরাও তৎক্ষণাৎ জড় দেহটিকে ত্যাগ করে। জীব ও তার অনুচরেরা যখন দেহটি ছেড়ে চলে যায়, তখন দেহটি আর কোন কর্ম করতে পারে না এবং তা পঞ্চভূতে লীন হয়ে যায়। শত্রুরা যখন কোন নগরী আক্রমণ

করে, তখন সেই নগরীর অধিবাসীরা সেই নগরী ছেড়ে চলে যায়, এবং শত্রুরা তখন বোমা বর্ষণ করে সেই নগরীটিকে ধূলিসাৎ করে। আমরা যখন বলি, "তুমি মৃত্তিকা, এবং মৃত্তিকাতেই তুমি পরিণত হবে," তখন আমরা এই দেহটিকে বোঝাই। শত্রুরা যখন কোন নগরী আক্রমণ করে তাতে বোমা বর্ষণ করে, তখন নাগরিকেরা সেই নগরী ত্যাগ করে চলে যায়, এবং সেই নগরীর আর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

মূর্খ ব্যক্তি কেবল নগরবাসীদের মঙ্গল বিবেচনা না করে নগরীর উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করে। তেমনই যে ব্যক্তি যথাযথভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়ার ফলে, দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মাই যে প্রধান তত্ত্ব তা জানে না, সে কেবল দেহটিকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। মানুষ যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখন আত্মা নিত্য দেহান্তরের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। যারা তাদের দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের *শ্রীমদ্ভাগবতে* গরু ও গাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (*স এব গোখরঃ*)। গাভী অত্যন্ত অবোধ পশু, আর গাধা হচ্ছে ভারবাহী পশু। যে-সমস্ত ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধির ফলে কঠোর পরিশ্রম করে, তারা গাধার মতো। তারা তাদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অবগত নয়। তাই বলা হয়েছে—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

"যে মানুষ কফ, পিত্ত ও বায়ু—এই তিনটি ধাতু দিয়ে তৈরি দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, যে তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন বলে মনে করে, যেই স্থানটিতে তার দেহের জন্ম হয়েছে, সেই স্থানটিকে পূজ্য বলে মনে করে, এবং দিব্য জ্ঞানসমন্বিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার পরিবর্তে যে কেবল স্নান করার জন্য তীর্থস্থানে যায়, সেই ব্যক্তি একটি গাধা বা গরুর মতো।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৮৪/১৩)

কৃষ্ণ-ভাবনাবিহীন মানব-সভ্যতা নিম্ন স্তরের পশুদের সভ্যতা মাত্র। কখনও কখনও এই সভ্যতা মৃত শরীর সম্বন্ধে গবেষণা করে, এবং মস্তিষ্ক অথবা হৃদয় সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে। কিন্তু আত্মার উপস্থিতি ব্যতীত দেহের কোন অঙ্গেরই কোন রকম গুরুত্ব থাকে না। গরু ও গাধার আধুনিক সভ্যতায় বৈজ্ঞানিকেরা মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্ক অথবা হৃদয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে মাত্র।

শ্লোক ২৫

বিকৃষ্যমাণঃ প্রসভং যবনেন বলীয়সা ।
নাবিন্দত্তমসাবিষ্টঃ সখায়ং সুহৃদং পুরঃ ॥ ২৫ ॥

বিকৃষ্যমাণঃ—টেনে নিয়ে যাচ্ছিল; **প্রসভম্**—বলপূর্বক; **যবনেন**—যবনদের দ্বারা; **বলীয়সা**—অত্যন্ত বলবান; **ন অবিন্দৎ**—স্মরণ করতে পারেননি; **তমসা**—অজ্ঞানের অন্ধকারের দ্বারা; **আবিষ্টঃ**—আচ্ছন্ন হয়ে; **সখায়ম্**—তার বন্ধু; **সুহৃদম্**—নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী; **পুরঃ**—প্রথম থেকে।

অনুবাদ

অত্যন্ত বলবান যবনেরা যখন বলপূর্বক রাজা পুরঞ্জনকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার ফলে, তিনি তাঁর সখা এবং নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী পরমাত্মাকে স্মরণ করতে পারেননি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

মানুষ যদি কেবল তিনটি বিষয়ে জানেন—যথা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা, তিনি সব কিছুর মালিক, এবং তিনি সমস্ত জীবের পরম বন্ধু, তা হলে তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে সর্বতোভাবে শান্তিলাভ করতে পারেন এবং সুখী হতে পারেন। কেউ যদি তা না জেনে দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আচরণ করেন, তা হলে তিনি সর্বদাই জড়া প্রকৃতির দ্বারা বিপর্যস্ত হয়ে, নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেন। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই পাশে বসে রয়েছেন। *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১)। জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই বৃক্ষে পাশাপাশি বসে রয়েছেন, কিন্তু জড়া প্রকৃতির দ্বারা বিপর্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও, মূর্খ জীব সেই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার লাভের জন্য ভগবন্মুখী হয় না। পক্ষান্তরে সে মনে করে যে, সে জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়ম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু তা সম্ভব হয় না। জীবকে ভগবন্মুখী হয়ে তাঁর শরণাগত হতে হয়। তখনই কেবল সে বলবান যবন বা যমরাজের প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

এই শ্লোকে *সখায়াম্* ('সখা') শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ভগবান চিরকাল জীবের পাশে উপস্থিত থাকেন। ভগবানকে *সুহৃদম্* ('শুভাকাঙ্ক্ষী') বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী, ঠিক পিতা অথবা মাতার মতো। পুত্রের শত অপরাধ সত্ত্বেও পিতা ও মাতা সর্বদাই পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী। তেমনই আমাদের সমস্ত অপরাধ সত্ত্বেও এবং ভগবানের ইচ্ছার অবাধ্যতা করা সত্ত্বেও, আমরা যদি কেবল ভগবানের শরণাগত হই, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*), তা হলে তিনি জড়া প্রকৃতির সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে আমাদের তৎক্ষণাৎ পরিত্রাণ করবেন। দুর্ভাগ্যবশত, অসৎ সঙ্গের ফলে এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের প্রতি প্রবল আসক্তির ফলে, আমরা আমাদের পরম বন্ধু পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করতে পারি না।

শ্লোক ২৬

তং যজ্ঞপশবোঽনেন সংজ্ঞপ্তা যেঽদয়ালুনা ।
কুঠারৈশ্চিচ্ছিদুঃ ক্রুদ্ধাঃ স্মরন্তোঽমীবমস্য তৎ ॥ ২৬ ॥

তম্—তাঁকে; **যজ্ঞ-পশবঃ**—যজ্ঞে বলি দেওয়ার পশু; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **সংজ্ঞপ্তাঃ**—নিহত; **যে**—যারা; **অদয়ালুনা**—অত্যন্ত নির্দয় ব্যক্তির দ্বারা; **কুঠারৈঃ**—কুঠারের দ্বারা; **চিচ্ছিদুঃ**—খণ্ড-খণ্ড করলেন; **ক্রুদ্ধাঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **স্মরন্তঃ**—স্মরণ করে; **অমীবম্**—পাপকর্ম; **অস্য**—তাঁর; **তৎ**—সেই।

অনুবাদ

সেই অত্যন্ত নির্দয় রাজা পুরঞ্জন বিভিন্ন যজ্ঞে বহু পশুহত্যা করেছিলেন। এখন সেই সমস্ত পশুরা সুযোগ পেয়ে তাদের শিং-এর দ্বারা তাঁকে বিদীর্ণ করতে লাগল। যেন তারা কুঠার দিয়ে তাঁকে খণ্ড-খণ্ড করে কাটতে লাগল।

তাৎপর্য

যারা ধর্মের নামে অথবা আহার করার জন্য পশুহত্যা করে, মৃত্যুর পর তাদের এই প্রকার দণ্ডভোগ করতে হয়। *মাংস* শব্দটি 'মাম্' (আমাকে) এবং 'স' (সে) এই শব্দ দুটির সমন্বয়; অর্থাৎ, যে পশুগুলিকে আমরা হত্যা করি, আবার আমাদেরকে হত্যা করার জন্য তাদের সুযোগ দিতে হবে। যদিও বাস্তবিকপক্ষে কোন জীবাত্মাকে হত্যা করা যায় না, তবুও মৃত্যুর পর সেই সমস্ত পশুদের

শিং-এর দ্বারা বিদীর্ণ হওয়ার বেদনা অনুভব করতে হয়। তা না জেনে, মূর্খেরা অসহায় পশুদের নির্বিবাদে হত্যা করে। তথাকথিত সভ্য মানব-সমাজ ধর্মের নামে অথবা আহারের জন্য বহু কসাইখানা খুলেছে। যারা একটু ধর্মপরায়ণ তারা মন্দিরে, মসজিদে অথবা উপাসনাস্থলে পশুহত্যা করে, আর যারা আরও অধঃপতিত তারা কসাইখানায় পশুহত্যা করে। ঠিক যেমন মানব-সমাজের আইন হচ্ছে জীবনের জন্য জীবন, তেমনই ভগবানের আইনেও অন্য কোন জীবের জীবন নেওয়ার অধিকার কারও নেই। পরম পিতা ভগবানের রাজ্যে বেঁচে থাকার অধিকার সকলেরই রয়েছে, এবং তাই ধর্মের নামে অথবা আহারের জন্য পশুহত্যাকে ভগবান সর্বদাই নিন্দা করেছেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"যারা হিংসাপরায়ণ ও ক্রূর এবং যারা নরাধম, তাদের আমি এই ভবসাগরে বিভিন্ন আসুরিক যোনিতে নিক্ষেপ করি।" পশু-ঘাতকেরা (*দ্বিষতঃ*) পরমেশ্বর ভগবান ও অন্যান্য জীবদের প্রতি হিংসাপরায়ণ বলে তাদের অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হয় এবং তাই তারা জীবনের উদ্দেশ্য কখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৭

অনন্তপারে তমসি মগ্নো নষ্টস্মৃতিঃ সমাঃ ।
শাশ্বতীরনুভূয়ার্তিং প্রমদাসঙ্গদূষিতঃ ॥ ২৭ ॥

অনন্ত-পারে—অপার; **তমসি**—জড় অস্তিত্বের অন্ধকারে; **মগ্নঃ**—নিমজ্জিত হয়ে; **নষ্ট-স্মৃতিঃ**—সমস্ত বুদ্ধিরহিত হয়ে; **সমাঃ**—বহু বছর; **শাশ্বতীঃ**—প্রায় অনন্তকাল; **অনুভূয়**—অনুভব করে; **আর্তিম্**—ত্রিতাপ দুঃখ; **প্রমদা**—রমণীর; **সঙ্গ**—সঙ্গের দ্বারা; **দূষিতঃ**—কলুষিত হয়ে।

অনুবাদ

রমণীর দূষিত সঙ্গ প্রভাবে, রাজা পুরঞ্জনের মতো জীবেরা নিত্যকাল সংসারের কষ্টভোগ করে, এবং বহু বহু বছর ধরে স্মৃতিরহিত হয়ে, তারা জড়-জাগতিক জীবনের অন্ধকার প্রদেশে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ-মহাভূতের মাধ্যমে জীব জড় জগতে প্রবেশ করে, এবং এইভাবে তার দেহ সৃষ্টি হয়। জীব যদিও দেহের ভিতর থেকে কার্য করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে অজ্ঞাত। জীব জড় সৃষ্টিতে প্রবেশ করে, কিন্তু মায়ার দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে, তাকে আচ্ছাদিত বলে মনে হয়। অবিদ্যার ফলে (*নাববুধ্যতে*) দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হয়। বুদ্ধিকে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তার কার্যকলাপের প্রাধান্যের জন্য তাকে এই শ্লোকে *অধীশঃ* বা অধীশ্বরী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জীব অগ্নি, জল এবং অন্নের দ্বারা জীবন ধারণ করে। এই তিনের সমন্বয়ের মাধ্যমে দেহের পালন হয়। তাই দেহকে বলা হয় *প্রকৃতি* । এই উপাদানগুলির সমন্বয়ের ফলে ক্রমশ মাংস, অস্থি, রক্ত ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। এগুলিকে বিভিন্ন বাসগৃহ বলে মনে হয়। *বেদে* বলা হয়েছে যে, পচনের পর খাদ্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়। কঠিন অংশ মলে পরিণত হয়, এবং অর্ধতরল অংশ মাংসে পরিণত হয়। তরল অংশ পীতবর্ণে পরিণত হয় এবং তারপর তা পুনরায় তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়। তার এক অংশ হচ্ছে মূত্র। তেমনই আগ্নেয় ভাগ তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়, এবং তার একটিকে বলা হয় অস্থি। পঞ্চভূতের মধ্যে অগ্নি, জল ও অন্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী শ্লোকে এই তিনটির উল্লেখ হয়েছে, কিন্তু আকাশ ও বায়ুর উল্লেখ হয়নি। এই সবের ব্যাখ্যা *ভগবদ্গীতায়* (১৩/২০) এইভাবে করা হয়েছে—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি ।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥

"জড়া প্রকৃতি ও জীব উভয়েই অনাদি। তাদের রূপান্তর এবং প্রকৃতির গুণ জড়া প্রকৃতিজাত।" প্রকৃতি এবং পুরুষ (জীব) শাশ্বত। তারা যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তখন বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয় এবং বিভিন্ন রূপের প্রকাশ হয়। এই সবই প্রকৃতির তিনটি গুণের মিথষ্ক্রিয়ার প্রতিফল বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ৫৯

তস্মিংস্ত্বং রাময়া স্পৃষ্টো রমমাণোঽশ্রুতস্মৃতিঃ ।
তৎসঙ্গাদীদৃশীং প্রাপ্তো দশাং পাপীয়সীং প্রভো ॥ ৫৯ ॥

তস্মিন্—সেই অবস্থায়; **ত্বম্**—তুমি; **রাময়া**—রমণীর সঙ্গে; **স্পৃষ্টঃ**—সম্পর্কযুক্ত হয়ে; **রমমাণঃ**—উপভোগ করে; **অশ্রুত-স্মৃতিঃ**—চিন্ময় অস্তিত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে;

তাম্—তার; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **গৃহ্ণন্**—গ্রহণ করে; **বভূব**—হয়েছিলেন; **প্রমদা**—নারী; **উত্তমা**—অতি উন্নত স্তরে অবস্থিত; **অনন্তরম্**—মৃত্যুর পর; **বিদর্ভস্য**—বিদর্ভের; **রাজ-সিংহস্য**—অত্যন্ত শক্তিশালী রাজার; **বেশ্মনি**—গৃহে।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেছিলেন, তাই তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি এক অতি সুন্দরী এবং উত্তম ললনা হয়েছিলেন। রাজারই গৃহে তিনি পরজন্মে বিদর্ভরাজের কন্যা হন।

তাৎপর্য

যেহেতু রাজা পুরঞ্জন তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা করেছিলেন, তাই তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। *ভগবদ্গীতার* (৮/৬) নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"মৃত্যুর সময় যে অবস্থা চিন্তা করে জীব দেহত্যাগ করে, সে তার পরবর্তী জীবনে নিঃসন্দেহে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে।"

যে বিশেষ বিষয়ের চিন্তায় জীব মগ্ন থাকে, মৃত্যুর সময় সে সেই বিষয়েই চিন্তা করবে। জাগ্রত অবস্থায়, স্বপ্নাবস্থায় অথবা সুষুপ্তিতে যে-চিন্তা জীবের জীবনকে ঘিরে থাকে, মৃত্যুর সময় সে সেই বিষয় চিন্তা করবে। ভগবানের সঙ্গ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর, জীব এইভাবে প্রকৃতির নিয়মে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে থাকে। অবশেষে সে মনুষ্যজন্ম লাভ করে। এই মনুষ্য-জীবনে যদি সে আধ্যাত্মিক জীবনকে অবহেলা করে জড়-জাগতিক চিন্তায় মগ্ন থাকে, এবং জন্ম-মৃত্যুর সমস্ত সমস্যার সমাধানকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করে, তা হলে সে তার পরবর্তী জীবনে একটি স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হবে, বিশেষ করে সে যদি তার পত্নীর কথা চিন্তা করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৩১/১) বলা হয়েছে—*কর্মণা দৈব-নেত্রেণ।* জীব কখনও পুণ্যকর্ম করে এবং কখনও পাপকর্ম করে, আবার কখনও দুইভাবে আচরণ করে। তার সমস্ত কর্মেরই হিসাব-নিকাশ রাখা হয়, এবং দৈবের তত্ত্বাবধানে জীব একটি নতুন শরীর প্রাপ্ত হয়। রাজা পুরঞ্জন যদিও তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত

ছিলেন, তবুও তিনি বহু পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাই একটি স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হলেও, তিনি রাজকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪১) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥

"অসফল যোগী বহু বছর ধরে পুণ্য জীবাত্মাদের লোকে সুখ উপভোগ করার পর, ধর্মপরায়ণ পরিবারে অথবা সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।"

কেউ যদি সকাম কর্ম, মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞান অথবা যোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকার ফলে, ভক্তিযোগের মার্গ থেকে অধঃপতিত হয়, তা হলে তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের নিযুক্ত করেছেন, যাতে তাঁরা জীবদের বাসনা অনুসারে, তাদের পূর্বকৃত কর্মের ন্যায্য ফল প্রদান করেন। যদিও রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তাঁর পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফলে, তিনি এক রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মূল কথা হচ্ছে যে, আর একটি শরীর দান করার পূর্বে, আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের মূল্যায়ন হয়। নারদ মুনি তাই ব্যাসদেবকে উপদেশ দিয়েছিলেন, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে অন্য সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করে, কেবল কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা। সেই উপদেশ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও দিয়েছিলেন। ভক্ত যদি আধ্যাত্মিক চেতনার স্তর থেকে বিচ্যুতও হন, তবুও পরবর্তী জীবনে তিনি ভগবদ্ভক্ত বা কোন ধনী ব্যক্তির গৃহে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হবেন। এইভাবে তিনি তাঁর ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান।

শ্লোক ২৯

উপয়েমে বীর্যপণাং বৈদর্ভীং মলয়ধ্বজঃ ।
যুধি নির্জিত্য রাজন্যান্ পাণ্ড্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ২৯ ॥

উপয়েমে—বিবাহ করেছিলেন; **বীর্য**—বীরত্বের; **পণাম্**—পুরস্কার; **বৈদর্ভীম্**—বিদর্ভ-দুহিতার; **মলয়-ধ্বজঃ**—মলয়ধ্বজ; **যুধি**—যুদ্ধে; **নির্জিত্য**—জয় করে; **রাজন্যান্**—অন্য রাজকুমারদের; **পাণ্ড্যঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, অথবা পাণ্ডু নামক দেশে যাঁর জন্ম হয়েছে; **পর**—দিব্য; **পুরম্**—নগরী; **জয়ঃ**—বিজেতা।

অনুবাদ

বিদর্ভরাজের দুহিতা বৈদর্ভীর বিবাহ হয়েছিল পাণ্ডু দেশের মলয়ধ্বজ নামক এক অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গে। অন্যান্য রাজকুমারদের পরাজিত করে তিনি বিদর্ভ-রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয় রাজকন্যাদের বিবাহের সময় কতকগুলি শর্ত প্রদান করার প্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন, দ্রৌপদীর বিবাহের সময় শর্ত ছিল যে, জলে একটি মাছের প্রতিবিম্ব দেখে, সেই মাছটিকে বাণবিদ্ধ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ সাতটি অত্যন্ত প্রবল বৃষকে পরাজিত করে, তাঁর এক মহিষীকে বিবাহ করেছিলেন। বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থায় রাজকন্যাদের সম্প্রদান করার সময় এই রকম প্রথার প্রচলন ছিল। বিদর্ভরাজের কন্যা বৈদর্ভীকে সম্প্রদান করা হয়েছিল একজন অত্যন্ত পরাক্রমশালী ভগবদ্ভক্ত রাজার সঙ্গে। যেহেতু রাজা মলয়ধ্বজ ছিলেন একজন পরাক্রমশালী রাজা এবং মহান ভক্ত, তাই তিনি সব কটি শর্ত পূর্ণ করেছিলেন। মলয়ধ্বজ নামটি একজন মহান ভগবদ্ভক্তকে সূচিত করে, যিনি মলয় পর্বতের মতো অটল এবং তাঁর প্রচারের দ্বারা তিনি অন্য ভক্তদেরও দৃঢ়ভাবে ভগবদ্ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রকার মহাভাগবত অন্য সমস্ত মতবাদের ঊর্ধ্বে ভগবদ্ভক্তির মহিমা স্থাপন করতে পারেন। সুদৃঢ় ভক্ত জ্ঞান-কর্ম-যোগ আদি অন্য সমস্ত আধ্যাত্মিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করেন। তাঁর ভক্তি-পতাকা উড়িয়ে, তিনি সর্বদা অন্যান্য আধ্যাত্মিক মতবাদকে খণ্ডন করতে দৃঢ়-সংকল্প থাকেন। যখনই ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে অভক্তের শাস্ত্রবিচার হয়, তখন ভক্ত সর্বদা বিজয়ী হন।

পাণ্ড্য শব্দটি আসছে *পণ্ডা* থেকে, যার অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞান'। অত্যন্ত পণ্ডিত না হলে, অভক্তদের মতবাদ খণ্ডন করা যায় না। *পর* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'দিব্য', এবং *পুর* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নগরী'। *পর-পুর* হচ্ছে বৈকুণ্ঠ বা ভগবদ্ধাম। অতএব *পর-পুর-জয়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, শুদ্ধ ভক্ত তাঁর প্রবল ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সমস্ত অভক্তিপূর্ণ মতবাদকে খণ্ডন করেন, এবং তিনি ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠকেও জয় করতে পারেন। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল বৈকুণ্ঠলোক জয় করা যায়। পরমেশ্বর ভগবানকে বলা হয় অজিত, অর্থাৎ যাঁকে কেউ জয় করতে পারে না, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাঁর প্রবল ভক্তির দ্বারা এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তির দ্বারা অনায়াসে তাঁকে জয় করতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভয়ও ভয় পায়, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় মা যশোদার হাতের যষ্টি দেখে ভয়

পেয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর ভক্ত ছাড়া আর কেউই জয় করতে পারে না। এই প্রকার একজন ভক্ত কৃপাপূর্বক বিদর্ভরাজের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

তস্যাং স জনয়াঞ্চক্র আত্মজামসিতেক্ষণাম্ ।
যবীয়সঃ সপ্ত সুতান্ সপ্ত দ্রবিড়ভূতৃতঃ ॥ ৩০ ॥

তস্যাম্—তাঁর থেকে; **সঃ**—রাজা; **জনয়াম্ চক্রে**—উৎপাদন করেছিলেন; **আত্মজাম্**—কন্যা; **অসিত**—নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ; **ঈক্ষণাম্**—যার চক্ষু; **যবীয়সঃ**—কনিষ্ঠ, অত্যন্ত শক্তিশালী; **সপ্ত**—সাত; **সুতান্**—পুত্র; **সপ্ত**—সাত; **দ্রবিড়**—দ্রাবিড় দেশের বা দক্ষিণ ভারতের; **ভূ**—ভূখণ্ড; **ভৃতঃ**—রাজা।

অনুবাদ

রাজা মলয়ধ্বজের একটি কন্যা হয়েছিল, যার চক্ষু ছিল অতি কৃষ্ণবর্ণ। তাঁর সাতটি পুত্র-সন্তানও হয়েছিল, যারা পরবর্তী কালে দ্রাবিড়দেশের রাজা হয়েছিলেন। এইভাবে সেই ভূখণ্ডে সাতজন রাজা ছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা মলয়ধ্বজ ছিলেন একজন মহান ভক্ত, এবং বিদর্ভ-রাজার কন্যার সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর, তিনি তাঁকে একটি অতি সুন্দরী কন্যা দান করেছিলেন, যার চোখ ছিল কৃষ্ণবর্ণ। আলংকারিকরূপে তার অর্থ হচ্ছে যে, তাঁর কন্যাও ছিলেন ভক্তিমতী, কারণ তাঁর চক্ষু সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ ছিল। ভক্তের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাঁর সাতটি পুত্র হচ্ছেন সাত প্রকার ভক্তির অঙ্গ—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন ও দাস্য। নবধা ভক্তির মধ্যে কেবল সাতটি প্রথমে দেওয়া হয়েছিল। অন্য দুটি—সখ্য এবং আত্মনিবেদনের বিকাশ পরবর্তী কালে হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবদ্ভক্তিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—বিধিমার্গ ও রাগমার্গ। ভগবানের সখা হওয়া এবং তাঁর কাছে আত্মনিবেদন রাগ-মার্গের অন্তর্গত। নবীন ভক্তের পক্ষে শ্রবণ, কীর্তন, কৃষ্ণস্মরণ, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা, বন্দনা, নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া, এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

যবীয়সঃ শব্দটি সূচিত করে যে, এই পন্থা অত্যন্ত শক্তিশালী। ভক্ত যখন *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ অর্চনং বন্দনং দাস্যম্*-এর পন্থায় ভগবানের

সেবায় যুক্ত হয়ে, এই পন্থাগুলিকে আয়ত্ত করেন, তখন ধীরে ধীরে রাগানুগা ভক্তি প্রাপ্ত হয়ে, *সখ্যম্* এবং *আত্মনিবেদনম্*ও প্রাপ্ত হন। সাধারণত যে-সমস্ত মহান আচার্য সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করেন, তাঁরা *সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্* স্তরের ভক্ত। নবীন ভক্ত প্রকৃতপক্ষে প্রচারক হতে পারে না। *শ্রবণং কীর্তনম্* আদি অন্য সাতটি ক্ষেত্রে ভক্তির অনুশীলন করতে নবীন ভক্তকে উপদেশ দেওয়া হয়। প্রাথমিক সাতটি অঙ্গ সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করতে পারলে, ভবিষ্যতে *সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্*-এর স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

দ্রাবিড়দেশের বিশেষ উল্লেখ দক্ষিণ ভারতের পঞ্চ-দ্রাবিড়দেশ সম্বন্ধে হয়েছে। ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক পন্থাগুলি (*শ্রবণং কীর্তনম্*) সম্পন্ন করতে সেই স্থানগুলি অত্যন্ত অনুকূল। রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য প্রমুখ অনেক মহান আচার্য দ্রাবিড়দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মহান প্রচারকে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই *সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্*-এর স্তরে অবস্থিত ছিলেন।

শ্লোক ৩১

একৈকস্যাভবত্তেষাং রাজন্নর্বুদমর্বুদম্ ।
ভোক্ষ্যতে যদ্বংশধরৈর্মহী মন্বন্তরং পরম্ ॥ ৩১ ॥

এক-একস্য—প্রত্যেকের; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **তেষাম্**—তাঁদের; **রাজন্**—হে রাজন্; **অর্বুদম্**—দশ কোটি; **অর্বুদম্**—দশ কোটি; **ভোক্ষ্যতে**—শাসন করেছিলেন; **যৎ**—যাঁর; **বংশ-ধরৈঃ**—বংশধরদের দ্বারা; **মহী**—সারা পৃথিবী; **মনু-অন্তরম্**—এক মনুর অন্ত পর্যন্ত; **পরম্**—এবং তার পর।

অনুবাদ

হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! মলয়ধ্বজের পুত্রেরা হাজার হাজার সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, এবং তাঁরা সকলে মন্বন্তর এবং তার পরেও সারা পৃথিবী পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়। এক মন্বন্তর বা একজন মনুর আয়ু হচ্ছে ৭১ × ৪৩,২০,০০০ বছর। এক মনুর পর আর এক মনুর আগমন হয়। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের জীবনচক্র চলতে থাকে। যেহেতু এক মনু আর এক মনুকে

অনুসরণ করেন, তাই কৃষ্ণভক্তির সম্প্রদায় চলতে থাকে, যা *ভগবদ্গীতায়* (৪/১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

শ্রীভগবানুবাচ
ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥

"শ্রীভগবান বললেন—আমি এই অবিনাশী যোগের বিজ্ঞান সূর্যদেব বিবস্বানকে দিয়েছিলাম, এবং বিবস্বান তা মানব-সমাজের পিতা মনুকে দান করেছিলেন, এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে দান করেন।" বিবস্বান *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান একজন মনুকে দিয়েছিলেন, এবং সেই মনু তা তাঁর পুত্রকে দান করেছিলেন, যিনি তা আর একজন মনুকে দান করেছিলেন। এইভাবে কৃষ্ণভক্তির প্রগতি কখনও প্রতিহত হয় না। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন একটি নতুন আন্দোলন। *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, এটি একটি অতি প্রাচীন আন্দোলন, কারণ তা এক মনু থেকে আর এক মনুতে পরম্পরা-ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে।

বৈষ্ণবদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত ব্যক্তিগত বৈষম্য সত্ত্বেও কৃষ্ণভক্তির ধারা অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে চলে। আমরা দেখতে পাই যে, বিগত একশ বছরের ভিতরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সুসংবদ্ধভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার শুরু করেছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শিষ্যেরা সকলেই আমার গুরুভ্রাতা, এবং যদিও আমাদের মধ্যে কিছু মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে এবং যদিও আমরা যৌথভাবে প্রচার করছি না, তবুও আমাদের সকলেই নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার করছেন এবং সারা পৃথিবী জুড়ে বহু শিষ্য গ্রহণ করছেন। আমরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ শুরু করেছি এবং হাজার হাজার ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকানরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। নবধা ভক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণভাবনামৃত সম্প্রদায় কখনই প্রতিহত হবে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ অথবা দেশের ভেদাভেদ বিচার না করে, তা প্রসারিত হতে থাকবে। কেউই তা প্রতিহত করতে পারবে না।

এই শ্লোকে *ভোক্ষ্যতে* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক যেমন রাজা তাঁর প্রজাদের রক্ষা করেন, তেমনই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করে, এই সমস্ত ভগবদ্ভক্তরা সারা পৃথিবীর মানুষদের রক্ষা করবেন। পৃথিবীর মানুষেরা আজ

তথাকথিত সমস্ত ধর্ম প্রচারক—স্বামী, যোগী, কর্মী ও জ্ঞানীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু তারা কেউই পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হওয়ার প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তির প্রচারকারী চারটি সম্প্রদায় এই ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে রামানুজ-সম্প্রদায়, মধ্ব-সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায় এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়। মধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বিশেষভাবে আসছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে। এই সমস্ত ভক্তরা ব্যাপকভাবে কৃষ্ণভক্তির প্রচার করে ভণ্ড অবতার, স্বামী, যোগী এবং অন্যান্যদের হাত থেকে নিরীহ মানুষদের রক্ষা করছে।

শ্লোক ৩২

অগস্ত্যঃ প্রাগ্দুহিতরমুপয়েমে ধৃতব্রতাম্ ।
যস্যাং দৃঢ়চ্যুতো জাত ইধ্মবাহাত্মজো মুনিঃ ॥ ৩২ ॥

অগস্ত্যঃ—মহর্ষি অগস্ত্য; **প্রাক্**—প্রথম; **দুহিতরম্**—কন্যা; **উপয়েমে**—বিবাহ করেছিলেন; **ধৃত-ব্রতাম্**—ব্রত ধারণকারী; **যস্যাম্**—যাঁর থেকে; **দৃঢ়চ্যুতঃ**—দৃঢ়চ্যুত নামক; **জাতঃ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **ইধ্মবাহ**—ইধ্মবাহ নামক; **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **মুনিঃ**—মহান ঋষি।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত মলয়ধ্বজের প্রথমা কন্যাকে অগস্ত্য মুনি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর থেকে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল, যার নাম ছিল দৃঢ়চ্যুত, এবং তাঁর পুত্রের নাম ছিল ইধ্মবাহ।

তাৎপর্য

অগস্ত্য মুনি নামটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অগস্ত্য মুনি মনের দ্যোতক। *অগস্ত্য* শব্দটি সূচিত করে যে, ইন্দ্রিয়গুলি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে না, এবং *মুনি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'মন'। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র, তাই ইন্দ্রিয়গুলি মন ছাড়া কাজ করতে পারে না। মন যখন ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে, তখন তা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। ভক্তির পন্থা (ভক্তিলতা) হচ্ছেন মলয়ধ্বজের প্রথমা কন্যা, এবং পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর চক্ষু সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ ছিল (*অসিতেক্ষণাম্*)। কোন দেব-দেবীদের ভক্তি করা যায় না। ভক্তি কেবল বিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হতে পারে (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*)। পরমতত্ত্বকে নির্বিশেষ

মনে করে মায়াবাদীরা বলে যে, যে-কোন প্রকার পূজার ক্ষেত্রেই ভক্তি প্রযুক্ত হতে পারে। তা যদি হত, তা হলে ভক্ত যে-কোন দেব দেবীর রূপ কল্পনা করে তাঁর পূজা করতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে কেবল শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর অবতারদেরই ভক্তি অর্পণ করা যায়। তাই ভক্তিলতা হচ্ছে দৃঢ়ব্রত, কারণ মন যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন মন আর বিচ্যুত হয় না। কেউ যদি অন্য কোন পন্থায়, কর্মযোগ অথবা জ্ঞানযোগের দ্বারা আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রসর হতে চায়, তা হলে তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কেউ যদি ভক্তিতে স্থির হয়, তা হলে তার আর পতন হয় না।

এইভাবে ভক্তিলতা থেকে দৃঢ়চ্যুতের জন্ম হয়, এবং দৃঢ়চ্যুত থেকে তাঁর পুত্র ইধ্মবাহের জন্ম হয়। *ইধ্মবাহ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যিনি যজ্ঞের সমীধ নিয়ে শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হন। এর তাৎপর্য হচ্ছে ভক্তিলতা মানুষকে আধ্যাত্মিক পদে স্থির করে। এইভাবে স্থির হলে তার আর কখনও অধঃপতন হয় না, এবং তাঁর পুত্র নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্রনির্দেশ পালন করেন, যে-সম্বন্ধে *বেদে* বলা হয়েছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

ভগবদ্ভক্তির মার্গে যাঁরা দীক্ষিত, তাঁরা নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক শাস্ত্রনির্দেশ অনুসরণ করেন।

শ্লোক ৩৩

বিভজ্য তনয়েভ্যঃ ক্ষ্মাং রাজর্ষির্মলয়ধ্বজঃ ।
আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং স জগাম কুলাচলম্ ॥ ৩৩ ॥

বিভজ্য—ভাগ করে; **তনয়েভ্যঃ**—তাঁর পুত্রদের মধ্যে; **ক্ষ্মাম্**—সারা পৃথিবীকে; **রাজ-ঋষিঃ**—মহান ঋষিসদৃশ রাজা; **মলয়ধ্বজঃ**—মলয়ধ্বজ নামক; **আরিরাধয়িষুঃ**—আরাধনা করার বাসনায়; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **সঃ**—তিনি; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **কুলাচলম্**—কুলাচলে।

অনুবাদ

তার পর রাজর্ষি মলয়ধ্বজ তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর রাজ্য ভাগ করে দিয়ে, একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার উদ্দেশ্যে কুলাচল নামক নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ মলয়ধ্বজ নিশ্চিতরূপে একজন মহাভাগবত ছিলেন। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা, ভক্তি সম্প্রদায় (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*) বিস্তার করার জন্য তিনি বহু পুত্র এবং শিষ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার শিষ্যদের মধ্যে সারা পৃথিবী ভাগ করে দেওয়া উচিত। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির প্রচারে যুক্ত হওয়া। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শিষ্য যখন উপযুক্ত হয় এবং প্রচার করতে সক্ষম হয়, তখন শ্রীগুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে অবসর গ্রহণ করে কোন নির্জন স্থানে বসে শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করা এবং নির্জন-ভজন করা। নির্জন-ভজনের অর্থ হচ্ছে কোন নির্জন স্থানে বসে নীরবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। এই নির্জন-ভজন নবীন ভক্তদের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নবীন ভক্তদের নির্জন স্থানে গিয়ে ভজন করতে কখনও উপদেশ দেননি। প্রকৃতপক্ষে, এই সম্বন্ধে তিনি একটি গীত লিখেছেন—

দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব ॥

এইভাবে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রত্যেক ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সুদক্ষ গুরুদেবের নির্দেশনায় সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা। পরিপক্ক অবস্থাতেই কেবল সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার থেকে অবসর গ্রহণ করে নির্জন স্থানে ভজন করা যায়। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের ভক্তরা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবানের বাণীর প্রচারকরূপে ভগবানের সেবা করছেন। এখন তাঁরা তাঁদের গুরুদেবকে সক্রিয় প্রচারকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করতে দিতে পারেন। শ্রীগুরুদেবের জীবনের অন্তিম অবস্থায়, ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে প্রচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা। এইভাবে শ্রীগুরুদেব নির্জন স্থানে বসে নির্জন-ভজন করতে পারেন।

শ্লোক ৩৪

হিত্বা গৃহান্ সুতান্ ভোগান্ বৈদর্ভী মদিরেক্ষণা ।
অন্বধাবত পাণ্ড্যেশং জ্যোৎস্নেব রজনীকরম্ ॥ ৩৪ ॥

হিত্বা—পরিত্যাগ করে; **গৃহান্**—গৃহ; **সুতান্**—সন্তান; **ভোগান্**—জড় সুখ; **বৈদর্ভী**—বিদর্ভরাজের কন্যা; **মদির-ঈক্ষণা**—মদির-নয়না; **অন্বধাবত**—অনুগমন

করেছিলেন; **পাণ্ড্য-ঈশম্**—রাজা মলয়ধ্বজ; **জ্যোৎস্না ইব**—চন্দ্রিকার মতো; **রজনী-করম্**—চন্দ্র।

অনুবাদ

চন্দ্রিকা যেমন চন্দ্রের অনুগমন করে, তেমনই মদির-নয়না বিদর্ভনন্দিনীও গৃহসুখ, পুত্র এবং ভোগ্যসামগ্রী পরিত্যাগ করে, তাঁর পতির অনুগামিনী হয়ে কুলাচলে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ঠিক যেমন বানপ্রস্থ আশ্রমে পত্নী পতির অনুগমন করেন, তেমনই শ্রীগুরুদেব যখন নির্জন-ভজনের জন্য অবসর গ্রহণ করেন, তখন তাঁর কিছু উন্নত ভক্ত তাঁর সেবা করার উদ্দেশ্যে তাঁর অনুগমন করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যারা পারিবারিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সুত, মিত এবং রমণী-সমাজের তথাকথিত সুখ পরিত্যাগ করে শ্রীগুরুদেবের সেবা করার জন্য এগিয়ে আসা। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর রচিত *গুর্বষ্টকের* একটি শ্লোক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদঃ।* শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা মনে রাখা যে, শ্রীগুরুদেবের সেবা করার মাধ্যমে তিনি অনায়াসে কৃষ্ণভাবনামৃতের পথে অগ্রসর হতে পারেন। সমস্ত শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধানের দ্বারা এবং তাঁর সেবা করার দ্বারা ভগবদ্ভক্তির পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়।

এই শ্লোকে *মদিরেক্ষণা* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *সন্দর্ভে মদির* শব্দটির অর্থ 'মাদক' বলে বর্ণনা করেছেন। যদি কারো চক্ষু ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে প্রমত্ত হয়, তা হলে তাকে *মদিরেক্ষণ* বলা যায়। রাণী বৈদর্ভীর চক্ষু অত্যন্ত মোহজনক ছিল, ঠিক যেমন মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে চক্ষু *মদিরেক্ষণ* হয়। উন্নত স্তরের ভক্ত না হলে, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় না।

শ্লোক ৩৫-৩৬

তত্র চন্দ্রবসা নাম তাম্রপর্ণী বটোদকা ।
তৎপুণ্যসলিলৈর্নিত্যমুভয়ত্রাত্মনো মৃজন্ ॥ ৩৫ ॥
কন্দাষ্টিভির্মূলফলৈঃ পুষ্পপর্ণৈস্তৃণোদকৈঃ ।
বর্তমানঃ শনৈর্গাত্রকর্শণং তপ আস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্র—সেখানে; **চন্দ্রবসা**—চন্দ্রবসাল নদী; **নাম**—নামক; **তাম্রপর্ণী**—তাম্রপর্ণী নদী; **বটোদকা**—বটোদকা নদী; **তৎ**—সেই সমস্ত নদীর; **পুণ্য**—পবিত্র; **সলিলৈঃ**—জলের দ্বারা; **নিত্যম্**—প্রতিদিন; **উভয়ত্র**—উভয়ভাবে; **আত্মনঃ**—নিজের; **মৃজন্**—ধৌত করে; **কন্দ**—কন্দ; **অষ্টিভিঃ**—বীজের দ্বারা; **মূল**—মূল; **ফলৈঃ**—এবং ফলের দ্বারা; **পুষ্প**—ফুল; **পর্ণৈঃ**—এবং পত্রের দ্বারা; **তৃণা**—ঘাস; **উদকৈঃ**—এবং জলের দ্বারা; **বর্তমানঃ**—নির্বাহ করে; **শনৈঃ**—ধীরে-ধীরে; **গাত্র**—তাঁর দেহ; **কর্শনম্**—কৃশ হয়েছিল; **তপঃ**—তপস্যা; **আস্থিতঃ**—করেছিলেন।

অনুবাদ

কুলাচলে চন্দ্রবসা, তাম্রপর্ণী এবং বটোদকা নামক নদী প্রবাহিত ছিল। রাজা মলয়ধ্বজ নিয়মিতভাবে সেই পবিত্র নদীগুলিতে গিয়ে স্নান করতেন। তার ফলে তিনি অন্তরে ও বাইরে উভয়ত পবিত্র হয়েছিলেন। তিনি স্নান করে কন্দ, বীজ, পাতা, ফুল, মূল, ফল ও ঘাস খেয়ে এবং জলপান করে জীবনধারণ করছিলেন। এইভাবে তিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

আমরা নিশ্চিতরূপে দেখতে পাই যে, কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতিসাধন করতে হলে, দেহের ভার নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কেউ যদি অত্যন্ত স্থূলকায় হয়ে যায়, তা হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর স্থূলকায় শিষ্যদের অত্যন্ত প্রবলভাবে সমালোচনা করতেন। অর্থাৎ যাঁরা কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতিসাধন করতে চান, তাঁদের পক্ষে অত্যধিক আহার করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তরা বনে, পাহাড়ে অথবা পর্বতে তীর্থ করতে যেতেন, কিন্তু বর্তমান সময়ে এই প্রকার কঠোর তপস্যা করা সম্ভব নয়। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কেবল ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার না করা। বৈষ্ণব দিনপঞ্জীতে একাদশী এবং ভগবান ও তাঁর ভক্তদের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথিতে উপবাস করার দিন রয়েছে। সেগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের মেদ হ্রাস করা, যাতে মানুষকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘুমাতে না হয় এবং তারা নিষ্ক্রিয় ও অলস না হয়ে যায়। অত্যধিক আহার করলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘুমাতে হয়। এই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তপশ্চর্যা এবং তপশ্চর্যা মানে হচ্ছে যৌন জীবন, আহার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা। এইভাবে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের জন্য সময় বাঁচানো যাবে, এবং মানুষ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয়ভাবেই নিজেকে পবিত্র করতে পারবে। তার ফলে শরীর ও মন উভয়ই শুদ্ধ হতে পারবে।

শ্লোক ৩৭

শীতোষ্ণবাতবর্ষাণি ক্ষুৎপিপাসে প্রিয়াপ্রিয়ে ।
সুখদুঃখে ইতি দ্বন্দ্বান্যজয়ৎসমদর্শনঃ ॥ ৩৭ ॥

শীত—ঠাণ্ডা; **উষ্ণ**—গরম; **বাত**—বায়ু; **বর্ষাণি**—এবং বর্ষা ঋতু; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **পিপাসে**—এবং পিপাসা; **প্রিয়**—আনন্দদায়ক; **অপ্রিয়ে**—অপ্রীতিকর; **সুখ**—সুখ; **দুঃখে**—এবং দুঃখে; **ইতি**—এইভাবে; **দ্বন্দ্বানি**—দ্বৈতভাব; **অজয়ৎ**—তিনি জয় করেছিলেন; **সম-দর্শনঃ**—সমদর্শী।

অনুবাদ

তপস্যার দ্বারা রাজা মলয়ধ্বজ তাঁর দেহে এবং মনে ধীরে ধীরে শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, বায়ু ও বর্ষা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, প্রিয় ও অপ্রিয় ইত্যাদি দ্বৈতভাবের প্রতি সমদর্শী হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সমস্ত দ্বন্দ্বভাব জয় করেছিলেন।

তাৎপর্য

মুক্তি মানে হচ্ছে জড় জগতের দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত হওয়া। আত্ম-উপলব্ধি লাভ না করা পর্যন্ত, মানুষকে এই আপেক্ষিক জগতের দ্বন্দ্বভাব ভোগ করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সহ্য করার মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বভাবকে জয় করতে উপদেশ দিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন যে, শীত ও উষ্ণ এই দ্বন্দ্বভাব আমাদের এই জড় জগতে কষ্ট দেয়। শীতের সময় আমরা স্নান করতে চাই না, কিন্তু গরমের সময় আমরা দুই-তিন বারেরও বেশি স্নান করতে ইচ্ছা করি। তাই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, এই প্রকার আপেক্ষিকতা এবং দ্বন্দ্বভাবের দ্বারা বিচলিত না হতে, কারণ তারা আসে আবার চলে যায়।

এই দ্বন্দ্বভাবের প্রতি সমদর্শী হতে হলে, সাধারণ মানুষকে অনেক তপস্যা করতে হয়। যারা জীবনের এই দ্বন্দ্বভাবের দ্বারা বিচলিত হয়, তারা একটি আপেক্ষিক স্থিতি গ্রহণ করেছে এবং তাই দেহাত্মবুদ্ধির অতীত হওয়ার জন্য এবং জড় অস্তিত্বের সমাপ্তি-সাধন করার জন্য তাদেরকে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তপস্যা করতে হয়। রাজা মলয়ধ্বজ গৃহত্যাগ করে কুলাচলে গিয়ে, পবিত্র নদীতে স্নান করে এবং কোনও রকম রন্ধন করা অন্ন আহার না করে, কেবল কন্দ, মূল, বীজ, ফুল ও পাতা খেয়ে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এগুলি অত্যন্ত কঠোর তপস্যা। এই যুগে তপস্যা করার জন্য গৃহত্যাগ করে, বনে অথবা হিমালয় পর্বতে যাওয়া

অত্যন্ত দুষ্কর। বাস্তবিকপক্ষে, তা প্রায় অসম্ভব। কাউকে যদি কেবল আমিষ আহার, নেশা, দ্যূতক্রীড়া এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাও তারা করতে পারে না। অতএব হিমালয় বা কুলাচল পর্বতে গিয়ে তারা কি করবে? এই যুগে এই প্রকার ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন, তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগের পন্থা গ্রহণ করার উপদেশ দিয়েছেন। ভক্তিযোগ আপনা থেকেই মানুষকে জীবনের দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত করবে। ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কেন্দ্রবিন্দু, এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই জড়া প্রকৃতির অতীত। তাই এই জড় জগতের দ্বৈতভাবের অতীত হতে হলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সর্বদা যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"পূর্ণ ভক্তি সহকারে যিনি আমার সেবায় যুক্ত হন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনি অচিরেই জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন।"

কেউ যদি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে আপনা থেকেই তাঁর জিহ্বা আদি সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত হয়ে যায়। পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে ভক্তিযোগে একবার যুক্ত হলে, আর অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে না। কারও যদি অধঃপতন হয়ও, তবুও তাতে কোন ক্ষতি নেই। সাময়িকভাবে তাঁর ভক্তি স্তব্ধ হলেও, শীঘ্রই তিনি আবার তাঁর ভক্তি শুরু করার সুযোগ পাবেন, এবং যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকে তিনি আবার তাঁর ভক্তি শুরু করতে পারবেন।

শ্লোক ৩৮

তপসা বিদ্যয়া পক্বকষায়ো নিয়মৈর্যমৈঃ ।
যুযুজে ব্রহ্মণ্যাত্মানং বিজিতাক্ষানিলাশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

তপসা—তপস্যার দ্বারা; **বিদ্যয়া**—বিদ্যার দ্বারা; **পক্ব**—দগ্ধ; **কষায়ঃ**—সমস্ত কলুষ; **নিয়মৈঃ**—বিধি-বিধানের দ্বারা; **যমৈঃ**—আত্ম-সংযমের দ্বারা; **যুযুজে**—তিনি নিবদ্ধ করেছিলেন; **ব্রহ্মণি**—আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **বিজিত**—সম্পূর্ণরূপে সংযত; **অক্ষ**—ইন্দ্রিয়; **অনিল**—প্রাণ; **আশয়**—চেতনা।

অনুবাদ

উপাসনা, তপস্যা, যম ও নিয়মাদির দ্বারা রাজা মলয়ধ্বজ তাঁর অন্তরের সমস্ত মল দগ্ধ করে, তাঁর ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্তকে জয় করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর আত্মাকে পরমব্রহ্ম (কৃষ্ণ) রূপী কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির করেছিলেন।

তাৎপর্য

যখনই *ব্রহ্মন্* শব্দটির উল্লেখ হয়, তখনই নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, তা হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমব্রহ্ম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেব। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি*—বাসুদেবই নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত। নির্বিশেষ 'কোন কিছুতে' মনকে কখনও স্থির করা যায় না। *ভগবদ্গীতায়* (১২/৫) তাই বলা হয়েছে, *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্*—"যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত, নিরাকার রূপে আসক্ত, তাদের পক্ষে পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর।" তাই, এখানে যখন বলা হয়েছে যে, রাজা মলয়ধ্বজ তাঁর মনকে ব্রহ্মে স্থির করেছিলেন, সেই 'ব্রহ্ম' হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান বা বাসুদেব।

শ্লোক ৩৯

আস্তে স্থাণুরিবৈকত্র দিব্যং বর্ষশতং স্থিরঃ ।
বাসুদেবে ভগবতি নান্যদ্বেদোদ্বহন্ রতিম্ ॥ ৩৯ ॥

আস্তে—অবস্থান করেছিলেন; **স্থাণুঃ**—অচল; **ইব**—সদৃশ; **একত্র**—এক স্থানে; **দিব্যম্**—দেবতাদের; **বর্ষ**—বৎসর; **শতম্**—এক শত; **স্থিরঃ**—স্থির; **বাসুদেবে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **ন**—না; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **বেদ**—জানা; **উদ্বহন্**—অধিকার করে; **রতিম্**—আকর্ষণ।

অনুবাদ

এইভাবে তিনি এক শত দিব্য বৎসর এক স্থানে স্থাণুর মতো স্থির হয়েছিলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিময়ী আসক্তি লাভ করেছিলেন, এবং সেই অবস্থায় স্থির হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ .

"বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, যিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণরূপে জেনে, আমার শরণাগত হন। এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৯) বাসুদেব বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সবকিছু, এবং যিনি তা জানেন তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবাদী। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। এই শ্লোকেও সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে *দিব্যং বর্ষশতম্* ('দেবতাদের গণনা অনুসারে একশ বছর')। দেবতাদের গণনা অনুসারে তাঁদের একদিন (বারো ঘণ্টা) হচ্ছে পৃথিবীর ছয় মাসের সমান। দেবতাদের একশ বছর এই পৃথিবীর ছত্রিশ হাজার বছরের সমান। অতএব রাজা মলয়ধ্বজ ছত্রিশ হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। তারপর তিনি ভগবদ্ভক্তিতে স্থির হয়েছিলেন। এই পৃথিবীতে এত বছর বাঁচতে হলে, মানুষকে বহুবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। তা শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত যথার্থ বলে প্রতিপন্ন করছে। কৃষ্ণভক্তির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে, স্থির নিশ্চিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছু এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই হচ্ছে পরম সিদ্ধি। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* (*মধ্য লীলা* ২২/৬২) বলা হয়েছে *কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।* কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার দ্বারা অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করার দ্বারা স্থির নিশ্চিত রূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সবকিছু, তখন তিনি সর্বতোভাবে পরম সিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যে সবকিছু, সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই কেবল যথেষ্ট নয়, সেই উপলব্ধিতে স্থির থাকা অবশ্য কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি, এবং রাজা মলয়ধ্বজ চরমে সেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

স ব্যাপকতয়াত্মানং ব্যতিরিক্ততয়াত্মনি ।
বিদ্বান্ স্বপ্ন ইবামর্শসাক্ষিণং বিররাম হ ॥ ৪০ ॥

সঃ—রাজা মলয়ধ্বজ; **ব্যাপকতয়া**—সর্বব্যাপী হওয়ার ফলে; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **ব্যতিরিক্ততয়া**—পৃথকত্বের দ্বারা; **আত্মনি**—আত্মায়; **বিদ্বান্**—সুশিক্ষিত; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **ইব**—সদৃশ; **অমর্শ**—বিশেষ বিবেচনা; **সাক্ষিণম্**—সাক্ষী; **বিররাম**—উদাসীন হয়েছিলেন; **হ**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

রাজা মলয়ধ্বজ আত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। আত্মা একস্থানে অবস্থিত কিন্তু পরমাত্মা সর্বব্যাপ্ত। তিনি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, জড়-দেহ আত্মা নয়, কিন্তু আত্মা হচ্ছে জড় দেহের সাক্ষী।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবেরা প্রায়ই জড়-দেহ, আত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়ে নিরাশ হয়। দুই প্রকার মায়াবাদী রয়েছে—বৌদ্ধ-দর্শনের অনুগামী এবং শঙ্কর-দর্শনের অনুগামী। বুদ্ধদেবের অনুগামীরা জড় দেহের অতীত আর কিছু রয়েছে বলে মানতে চায় না; শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা সিদ্ধান্ত করে যে, পরমাত্মার কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। শঙ্কর মতাবলম্বীরা বিশ্বাস করে যে, চরমে আত্মা ও পরমাত্মা এক। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানসমন্বিত বৈষ্ণব দার্শনিকেরা জানেন যে, জড় দেহটি বহিরঙ্গা শক্তি থেকে সৃষ্ট এবং পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান জীবদেহে আত্মার সঙ্গে অবস্থান করছেন, কিন্তু তিনি আত্মা থেকে ভিন্ন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) বলেছেন—

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥

"হে অর্জুন! তুমি অবগত হও যে, আমি সমস্ত দেহ সম্বন্ধে জানি। এই দেহ এবং তার দেহীকে জানাই হচ্ছে জ্ঞান। সেটিই আমার মত।"

দেহটিকে ক্ষেত্র বলে মনে করা হয়, এবং জীবাত্মা সেই ক্ষেত্রে কার্য করে। কিন্তু আর একটি আত্মা রয়েছে, যাকে বলা হয় পরমাত্মা, যিনি আত্মার সঙ্গে সাক্ষীরূপে বিরাজ করছেন। জীবাত্মা দেহের মাধ্যমে কর্ম করে তার ফল ভোগ করে, কিন্তু পরমাত্মা কেবল সাক্ষীরূপে জীবাত্মার কার্যকলাপ দর্শন করেন, তিনি কর্মফল ভোগ করেন না। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে পরমাত্মা উপস্থিত রয়েছেন, কিন্তু জীবাত্মা কেবল তার দেহেই বিরাজমান। রাজা মলয়ধ্বজ সেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে আত্মা, পরমাত্মা এবং জড় দেহের পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪১

সাক্ষাদ্ভগবতোক্তেন গুরুণা হরিণা নৃপ ।
বিশুদ্ধজ্ঞানদীপেন স্ফুরতা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৪১ ॥

সাক্ষাৎ—স্বয়ং; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **উক্তেন**—উপদিষ্ট; **গুরুণা**—শ্রীগুরুদেব; **হরিণা**—ভগবান শ্রীহরির দ্বারা; **নৃপ**—হে রাজন্; **বিশুদ্ধ**—শুদ্ধ; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **দীপেন**—আলোকের দ্বারা; **স্ফুরতা**—প্রকাশ করে; **বিশ্বতঃ-মুখম্**—সর্বতোভাবে।

অনুবাদ

রাজা মলয়ধ্বজ পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছিলেন কারণ তাঁর শুদ্ধ স্থিতিতে তিনি স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই প্রকার দিব্য জ্ঞানের আলোকে তিনি সর্বতোভাবে সব কিছু উপলব্ধি করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সাক্ষাদ্ভাগবতোক্তেন গুরুণা হরিণা* শব্দগুচ্ছটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জীবাত্মা যখন ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, তখন ভগবান স্বয়ং সেই ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন। ভগবান সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (১০/১০) প্রতিপন্ন করেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার দ্বারা তারা আমার কাছে আসতে পারে।"

পরমাত্মারূপে ভগবান সকলেরই হৃদয়ে অবস্থান করছেন, এবং তিনি হচ্ছেন *চৈত্যগুরু।* কিন্তু শুদ্ধ ভক্তদেরই কেবল তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপদেশ দেন। ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক স্তরে, নিষ্ঠাবান এবং ঐকান্তিক ভক্তকে ভগবান অন্তর থেকে অনুপ্রেরণা দেন সদ্গুরুর শরণাগত হতে। বৈধীভক্তির বিধান অনুসারে, শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করার পর, শিষ্য যখন স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে ভগবানের প্রতি আসক্ত হন (*রাগভক্তি*), তখন ভগবান তাঁকে তাঁর অন্তর থেকে উপদেশ দেন। *তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।* এই কৃপা মুক্ত-জীবেরাই কেবল লাভ করতে পারেন। এই স্তর প্রাপ্ত হয়ে, রাজা মলয়ধ্বজ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪২

পরে ব্রহ্মণি চাত্মানং পরং ব্রহ্ম তথাত্মনি ।
বীক্ষমাণো বিহায়েক্ষামস্মাদুপররাম হ ॥ ৪২ ॥

পরে—পরম; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্মে; **চ**—এবং; **আত্মানম্**—আত্মা; **পরম্**—পরম; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **তথা**—ও; **আত্মনি**—আত্মায়; **বীক্ষমাণঃ**—দর্শন করে; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **ঈক্ষাম্**—দৃষ্টি; **অস্মাৎ**—এই পন্থা থেকে; **উপররাম**—অবসর গ্রহণ করেছিলেন; **হ**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

এইভাবে রাজা মলয়ধ্বজ দর্শন করেছিলেন যে, পরমাত্মা তাঁর পাশে বসে রয়েছেন, এবং জীবাত্মা রূপে তিনিও পরমাত্মার পাশে বসে রয়েছেন। তাঁরা উভয়ে একত্রে থাকার ফলে, তাঁদের ভিন্ন স্বার্থ ছিল না; এইভাবে তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির উন্নত স্তরে, ভক্ত তাঁর নিজের স্বার্থ এবং ভগবানের স্বার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। উভয় স্বার্থই তখন একাকার হয়ে যায়, কারণ ভক্ত তখন ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কার্য করেন না। তিনি যা কিছুই করেন, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের স্বার্থে। সেই সময় তিনি সব কিছুই ভগবানে দর্শন করেন এবং ভগবানকে সব কিছুতে দর্শন করেন। উপলব্ধির এই স্তর প্রাপ্ত হয়ে, তিনি চিৎ-জগৎ এবং জড় জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। এই জড় জগৎ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি হওয়ার ফলে, তাঁর চিন্ময় দৃষ্টিতে, এই জড় জগৎও চিন্ময় জগতে পর্যবসিত হয়। শুদ্ধ ভক্তের কাছে শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন। তাই তথাকথিত জড় জগৎ তাঁর কাছে চিন্ময় হয়ে যায় (*সর্বং খলিদং ব্রহ্ম*)। সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সেবার নিমিত্ত, এবং নিপুণ ভক্ত তথাকথিত যে-কোন জড় বস্তুকে ভগবানের সেবায় ব্যবহার করতে পারেন। চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে, ভগবানের সেবা করা যায় না। তাই তথাকথিত জড় বস্তুকে যদি ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা যায়, তা হলে আর তার জড়ত্ব থাকে না। এইভাবে বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে, শুদ্ধ ভক্ত সবকিছুই চিন্ময়রূপে দর্শন করেন।

শ্লোক ৪৩

পতিং পরমধর্মজ্ঞং বৈদর্ভী মলয়ধ্বজম্ ।
প্রেম্না পর্যচরদ্ধিত্বা ভোগান্ সা পতিদেবতা ॥ ৪৩ ॥

পতিম্—তাঁর পতি; **পরম**—পরম; **ধর্ম-জ্ঞম্**—ধর্মজ্ঞ; **বৈদর্ভী**—বিদর্ভরাজের কন্যা; **মলয়ধ্বজম্**—মলয়ধ্বজ নামক; **প্রেম্না**—প্রীতি এবং অনুরাগ সহকারে; **পর্যচরৎ**—ভক্তিপূর্বক সেবা করেছিলেন; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ভোগান্**—ইন্দ্রিয়সুখ; **সা**—তিনি; **পতি-দেবতা**—তাঁর পতিকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে।

অনুবাদ

বৈদর্ভী তাঁর পতিকে সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করে, সর্বতোভাবে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক তাঁর মহাভাগবত পতিকে অনুসরণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সেবায় যুক্ত ছিলেন।

তাৎপর্য

আলঙ্কারিকভাবে, রাজা মলয়ধ্বজ হচ্ছেন গুরুদেব, এবং তাঁর পত্নী বৈদর্ভী হচ্ছেন শিষ্য। শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *গুর্বষ্টকে* উল্লেখ করেছেন, *সাক্ষাদ্ধরিত্বেন*—"শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবানরূপে মনে করেন।" মায়াবাদীরা যেভাবে গুরুকে গ্রহণ করে, সেইভাবে গুরু গ্রহণ না করে, এখানে উল্লেখিত নির্দেশ অনুসারে তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। যেহেতু শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের সবচাইতে বিশ্বস্ত সেবক, তাই তাঁকে ঠিক পরমেশ্বর ভগবানের মতো বলে মনে করা উচিত। শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে কখনও তাঁকে অবহেলা করা উচিত নয় বা তাঁর আদেশ অমান্য করা উচিত নয়।

বহু ভাগ্যের ফলে কোন স্ত্রী যদি শুদ্ধ ভক্তের পত্নী হন, তা হলে ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা পরিত্যাগ করে তিনি তাঁর পতির সেবায় যুক্ত হতে পারেন। তিনি যদি তাঁর পতির সেবায় যুক্ত থাকেন, তা হলে তাঁর পতির আধ্যাত্মিক সিদ্ধি তিনি আপনা থেকেই লাভ করবেন। শিষ্য যদি সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হন, তা হলে কেবল তাঁর প্রসন্নতা বিধানের দ্বারা তিনি ভগবানের সেবা করার সুযোগ লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৪৪

চীরবাসা ব্রতক্ষামা বেণীভূতশিরোরুহা ।
বভাবুপপতিং শান্তা শিখা শান্তমিবানলম্ ॥ ৪৪ ॥

চীর-বাসা—জীর্ণ বসন পরিহিতা; **ব্রত-ক্ষামা**—ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে শীর্ণ কলেবর; **বেণী-ভূত**—জটাবদ্ধ; **শিরোরুহা**—তাঁর চুল; **বভৌ**—উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিতা; **উপ-পতিম্**—পতির নিকটে; **শান্তা**—প্রশান্ত; **শিখা**—অগ্নিশিখা; **শান্তম্**—বিচলিত না হয়ে; **ইব**—সদৃশ; **অনলম্**—অগ্নি।

অনুবাদ

ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে বিদর্ভরাজের কন্যার শরীর ক্ষীণ হয়েছিল, এবং তিনি জীর্ণ বসন পরিধান করেছিলেন। তাঁর কেশকলাপের যত্ন না নেওয়ার ফলে তা জটাবদ্ধ হয়েছিল। যদিও তিনি সর্বদা তাঁর পতির নিকটে থাকতেন, তবুও তিনি অবিচল দীপশিখার মতো মৌন এবং উজ্জ্বলরূপে অবস্থান করতেন।

তাৎপর্য

যখন কাঠে আগুন জ্বালানো হয়, তখন প্রথমে ধোঁয়া ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। কিন্তু প্রথমে নানা রকম অসুবিধা থাকলেও, একবার যখন আগুন জ্বলে ওঠে, তখন কাঠ দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। তেমনই পতি ও পত্নী উভয়ই যখন তপশ্চর্যার জীবন পালন করেন, তখন তাঁরা নীরব থাকেন এবং যৌন আবেদনের দ্বারা বিচলিত হন না। তখন পতি ও পত্নী উভয়েই পারমার্থিক প্রগতির ফলে লাভবান হন। বিলাসবহুল জীবন পূর্ণরূপে ত্যাগ করার ফলে, এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই শ্লোকে *চীরবাসা* শব্দটি অত্যন্ত জীর্ণ বসন বোঝায়। বিশেষ করে পত্নীর মূল্যবান সাজ-পোশাকের বাসনা এবং বিলাসবহুল জীবনের মান পরিত্যাগ করে, তপস্বিনীর জীবন যাপন করতে হয়। জীবন-ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু গ্রহণ করে এবং আহার ও নিদ্রার পরিমাণ যতখানি হ্রাস করা সম্ভব তা করে জীবন যাপন করতে হয়। যৌনসঙ্গমের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। পত্নী যদি কেবল মাত্র মহান শুদ্ধ ভক্ত পতির সেবায় যুক্ত থাকেন, তা হলে তিনি কখনও যৌন বাসনার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হন না। বানপ্রস্থ-আশ্রমের অবস্থা ঠিক এই রকম। পত্নী যদিও পতির সঙ্গে থাকেন, তবুও তিনি কঠোর তপশ্চর্যা পালন করেন, যাতে পতি-পত্নী একসঙ্গে থাকলেও যৌন জীবনের কোন প্রশ্ন ওঠে না। এইভাবে পতি

ও পত্নী একত্রে নিরন্তর বাস করতে পারেন। যেহেতু পত্নী পতির থেকে দুর্বল, তাই সেই দুর্বলতা এই শ্লোকে *উপ পতিম্* শব্দে ব্যক্ত হয়েছে। *উপ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নিকটে', অথবা 'প্রায় সমান'। পুরুষ হওয়ার ফলে, পতি সাধারণত পত্নীর থেকে পারমার্থিক দিক দিয়ে অধিক উন্নত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পত্নীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় যে, তিনি সব রকম বিলাসবহুল অভ্যাসগুলি বর্জন করবেন। তিনি কখনও সুন্দর বসন পরিধান করবেন না অথবা তাঁর চুল আঁচড়াবেন না। চুল আঁচড়ানো মেয়েদের একটি প্রধান কাজ। বানপ্রস্থ আশ্রমে পত্নী তাঁর কেশকলাপের কোন প্রকার যত্ন নেবেন না। এইভাবে তাঁর কেশকলাপ জটাবদ্ধ হয়ে যাবে। তার ফলে পত্নী আর তাঁর পতির কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হবে না, এবং তিনি নিজেও যৌন আবেদনের দ্বারা বিচলিত হবেন না। এইভাবে পতি ও পত্নী উভয়েই পারমার্থিক চেতনায় অগ্রসর হতে পারেন। এই অতি উন্নত স্তরকে বলা হয় *পরমহংস* স্তর, এবং তা একবার প্রাপ্ত হলে, পতি ও পত্নী উভয়েই দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হতে পারেন। শিষ্য যদি শ্রীগুরুদেবের সেবায় নিষ্ঠাপরায়ণ থাকেন, তা হলে আর তাঁর মায়ার বন্ধনে অধঃপতিত হওয়ার ভয় থাকে না।

শ্লোক ৪৫

অজানতী প্রিয়তমং যদোপরতমঙ্গনা ।
সুস্থিরাসনমাসাদ্য যথাপূর্বমুপাচরৎ ॥ ৪৫ ॥

অজানতী—অজ্ঞান; **প্রিয়-তমম্**—তাঁর প্রিয়তম পতি; **যদা**—যখন; **উপরতম্**—পরলোকে গমন করেছিলেন; **অঙ্গনা**—নারী; **সুস্থির**—স্থিরভাবে; **আসনম্**—আসনে; **আসাদ্য**—তাঁর কাছে গিয়ে; **যথা-পূর্বম্**—পূর্বের মতো; **উপাচরৎ**—তাঁর সেবা করতে থাকেন।

অনুবাদ

বিদর্ভনন্দিনী তাঁর পতি যে দেহত্যাগ করেছেন তা বুঝতে না পারা পর্যন্ত, স্থির আসনে উপবিষ্ট তাঁর পতির সেবা করে যেতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, রাণী যখন তাঁর পতির সেবা করতেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতেন না। তিনি নিঃশব্দে তাঁর কর্তব্যকর্ম করে

যেতেন। এইভাবে তিনি তাঁর সেবা করেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পতি দেহত্যাগ করেছেন।

শ্লোক ৪৬

যদা নোপলভেতাঙ্ঘ্রাবুষ্মাণং পত্যুরর্চতী ।
আসীৎসংবিগ্নহৃদয়া যূথভ্রষ্টা মৃগী যথা ॥ ৪৬ ॥

যদা—যখন; **ন**—না; **উপলভেত**—অনুভব করেছিলেন; **অঙ্ঘ্রৌ**—পায়ে; **উষ্মাণম্**—তাপ; **পত্যুঃ**—তাঁর পতির; **অর্চতী**—সেবা করার সময়; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **সংবিগ্ন**—উদ্বিগ্ন; **হৃদয়া**—অন্তরে; **যূথভ্রষ্টা**—পতিবিহীনা; **মৃগী**—হরিণী; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

তিনি যখন তাঁর পতির পদসেবা করছিলেন, তখন তিনি উষ্ণতা অনুভব না করার ফলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি দেহত্যাগ করেছেন। তখন তিনি তাঁর পতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকিনী হওয়ার ফলে, যূথভ্রষ্টা হরিণীর মতো ব্যাকুল হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যখনই শরীরে রক্ত এবং বায়ুর সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়, তখন বোঝা যায় যে, আত্মা দেহত্যাগ করেছে। রক্ত সঞ্চালন যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দেহ জীবিত না মৃত তা বোঝা যায় হৃদয়ের স্পন্দন এবং হাত ও পায়ের উষ্ণতা থেকে।

শ্লোক ৪৭

আত্মানং শোচতী দীনমবন্ধুং বিক্লবাশ্রুভিঃ ।
স্তনাবাসিচ্য বিপিনে সুস্বরং প্ররুরোদ সা ॥ ৪৭ ॥

আত্মানম্—নিজের সম্বন্ধে; **শোচতী**—শোক করতে করতে; **দীনম্**—দুঃখী; **অবন্ধুম্**—বন্ধুহীন; **বিক্লব**—ভগ্নহৃদয়; **অশ্রুভিঃ**—অশ্রুর দ্বারা; **স্তনৌ**—স্তনযুগল; **আসিচ্য**—সিক্ত করে; **বিপিনে**—অরণ্যে; **সু-স্বরম্**—উচ্চস্বরে; **প্ররুরোদ**—ক্রন্দন করতে লাগলেন; **সা**—তিনি।

অনুবাদ

সেই বিদর্ভনন্দিনী অরণ্যে তাঁর বৈধব্য দশার নিমিত্ত শোক করতে করতে অবিরাম অশ্রুধারায় স্তনযুগল সিক্ত করে, উচ্চস্বরে রোদন করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

রূপক অর্থে রাণী হচ্ছেন শিষ্য এবং রাজা হচ্ছেন গুরু; এইভাবে শ্রীগুরুদেব যখন দেহত্যাগ করেন, তখন শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে রাজার বিরহে রাণী যেভাবে ক্রন্দন করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে ক্রন্দন করা। কিন্তু, গুরু ও শিষ্যের কখনও বিচ্ছেদ হয় না, কারণ শিষ্য যতক্ষণ শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ নিষ্ঠা সহকারে পালন করেন, ততক্ষণ শ্রীগুরুদেব সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকেন। তাকে বলা হয় *বাণীর* সঙ্গ। দৈহিক উপস্থিতিকে বলা হয় *বপুঃ।* শ্রীগুরুদেব যতক্ষণ প্রকট থাকেন, ততক্ষণ শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের বপুর সেবা করা, এবং শ্রীগুরুদেব যখন অপ্রকট হন, তখন শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের বাণীর সেবা করা।

শ্লোক ৪৮

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজর্ষে ইমামুদধিমেখলাম্ ।
দস্যুভ্যঃ ক্ষত্রবন্ধুভ্যো বিভ্যতীং পাতুমর্হসি ॥ ৪৮ ॥

উত্তিষ্ঠ—দয়া করে উঠুন; **উত্তিষ্ঠ**—দয়া করে উঠুন; **রাজ-ঋষে**—হে রাজর্ষি; **ইমাম্**—এই পৃথিবী; **উদধি**—সমুদ্রের দ্বারা; **মেখলাম্**—বেষ্টিত; **দস্যুভ্যঃ**—দস্যুদের; **ক্ষত্র-বন্ধুভ্যঃ**—দুষ্ট রাজাদের; **বিভ্যতীম্**—অত্যন্ত ভীত; **পাতুম্**—রক্ষা করা; **অর্হসি**—উচিত।

অনুবাদ

হে রাজর্ষে! উঠুন! উঠুন! দেখুন, জলধি বেষ্টিতা ধরিত্রী দস্যু এবং তথাকথিত রাজাতে ভরে গেছে। তাই ধরিত্রী অত্যন্ত ভীতা হয়েছেন, এবং আপনার কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে রক্ষা করা।

তাৎপর্য

ভগবান অথবা তাঁর প্রতিনিধির আদেশে যখন কোন আচার্য এই পৃথিবীতে আসেন, তখন তিনি ধর্ম সংস্থাপন করেন, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* ঘোষণা করা হয়েছে।

ধর্ম শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের আদেশ পালন করা। কেউ যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তখন থেকেই তার ধর্ম অনুশীলন শুরু হয়। আচার্যের কর্তব্য হচ্ছে সদ্ধর্মের প্রচার করে, সকলকে ভগবানের শরণাগত হতে অনুপ্রাণিত করা। ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা, বিশেষ করে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ আদি নবধা ভক্ত্যঙ্গের দ্বারা ধর্মের আচরণ হয়। দুর্ভাগ্যবশত যখন আচার্য অপ্রকট হন, তখন সেই সুযোগে তথাকথিত স্বামী, যোগী, পরোপকারী, সমাজসেবক ইত্যাদি রূপে দুর্বৃত্ত এবং অভক্তরা অপসিদ্ধান্ত প্রচার করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করা। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩৪) উল্লেখ করা হয়েছে—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

"তোমার মনের দ্বারা সর্বদা আমার বিষয়ে চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও। আমাকে প্রণতি নিবেদন কর, আমার আরাধনা কর। সম্পূর্ণরূপে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে, তুমি অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে।"

মানব-সমাজের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা ভগবানের বিষয় চিন্তা করা, তাঁর ভক্ত হওয়া, তাঁর আরাধনা করা এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা। ভগবানের প্রতিনিধি বা আচার্য এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, কিন্তু তিনি যখন অপ্রকট হন, তখন পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আচার্যের প্রকৃত শিষ্য নিষ্ঠা সহকারে আচার্যের নির্দেশ অনুসরণ করার দ্বারা সেই পরিস্থিতির সংশোধন করার চেষ্টা করেন। বর্তমানে সারা পৃথিবী দুর্বৃত্ত এবং অভক্তদের ভয়ে ভীত; তাই অধর্মের প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করা হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ এবং শান্তি স্থাপন করার জন্য এই আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করা।

শ্লোক ৪৯

এবং বিলপন্তী বালা বিপিনেঽনুগতা পতিম্ ।
পতিতা পাদয়োর্ভর্তূ রুদত্যশ্রূণ্যবর্তয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিলপন্তী**—বিলাপ করে; **বালা**—অবলা রমণী; **বিপিনে**—সেই নির্জন অরণ্যে; **অনুগতা**—নিষ্ঠাভরে অনুগামিনী; **পতিম্**—পতির; **পতিতা**—পতিত

হয়ে; **পাদয়োঃ**—পদযুগলে; **ভর্তুঃ**—পতির; **রুদতী**—ক্রন্দন করতে লাগলেন; **অশ্রূণি**—অশ্রু; **অবর্তয়ৎ**—বিসর্জন করেছিলেন।

অনুবাদ

পতির অনুগামিনী সেই পতিব্রতা স্ত্রী সেই নির্জন অরণ্যে তাঁর পতির পদযুগলে পতিতা হয়ে, করুণ স্বরে রোদন করতে লাগলেন। তখন তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছিল।

তাৎপর্য

পতির বিরহে পতিব্রতা স্ত্রী যেভাবে বেদনা অনুভব করেন, শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটে শিষ্যের সেইভাবে শোকসন্তপ্ত হওয়া উচিত।

শ্লোক ৫০

চিতিং দারুময়ীং চিত্বা তস্যাং পত্যুঃ কলেবরম্ ।
আদীপ্য চানুমরণে বিলপন্তী মনো দধে ॥ ৫০ ॥

চিতিম্—চিতা; **দারু-ময়ীম্**—কাঠ দিয়ে তৈরি; **চিত্বা**—রচনা করে; **তস্যাম্**—তাতে; **পত্যুঃ**—পতির; **কলেবরম্**—দেহ; **আদীপ্য**—প্রদীপ্ত করে; **চ**—ও; **অনুমরণে**—সহমরণে; **বিলপন্তী**—বিলাপ করতে করতে; **মনঃ**—তাঁর মন; **দধে**—স্থির করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর তিনি কাঠ দিয়ে চিতা রচনা করে তাতে তাঁর পতির কলেবর প্রদীপ্ত করে, বিলাপ করতে করতে তাঁর পতির অনুসরণে সহমরণে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সমাজে পতিব্রতা স্ত্রীর মৃত পতির অনুগামিনী হয়ে, সহমরণ বরণ করা একটি অতি প্রাচীন প্রথা। ব্রিটিশদের রাজত্বকালেও ভারতবর্ষে এই প্রথাটি প্রচলিত ছিল। তখন অবশ্য পত্নী স্বেচ্ছায় পতির সঙ্গে মরতে চাইত না, এবং কখনও কখনও তাদের আত্মীয়রা জোর করে তাদের পুড়িয়ে মারত। বৈদিক প্রথাটি কিন্তু সেই রকম ছিল না। স্ত্রী স্বেচ্ছায় পতির চিতাগ্নিতে প্রবেশ করতেন। ব্রিটিশ

সরকার এই প্রথাটিকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে মনে করে তা রদ করেছিল। কিন্তু, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর, তাঁর দুই পত্নী মাদ্রী ও কুন্তী বিবেচনা করেছিলেন যে, তাঁরা দুজনেই সহমৃতা হবেন কি না, এবং অবশেষে তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, একজন সহমৃতা হবেন এবং অন্য আর একজন তাঁদের শিশু-সন্তানদের পালনের জন্য এই পৃথিবীতে থাকবেন। মাদ্রী দাবি করেছিলেন যে, যেহেতু তাঁর কারণে তাঁর পতির মৃত্যু হয়েছে, তাই তিনি সহমৃতা হবেন এবং কুন্তী যেন এখানে থেকে তাঁদের পঞ্চপুত্রকে পালন করেন। ১৯৩৬ সালেও আমরা এক পতিব্রতা স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় পতির চিতাগ্নিতে সহমৃতা হতে দেখেছি।

তা সূচিত করে যে, পতিব্রতা স্ত্রীর এইভাবে আচরণ করতে প্রস্তুত থাকা অবশ্য কর্তব্য। তেমনই, গুরুগতপ্রাণ শিষ্যও মনে করেন যে, শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালনে অক্ষম হওয়ার থেকে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে পরলোকে গমন করা শ্রেয়। পরমেশ্বর ভগবান যেমন ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য এই পৃথিবীতে আসেন, তেমনই তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবও সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে আসেন। শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করার দায়িত্বভার গ্রহণ করা। শিষ্য যদি তা করতে না পারেন, তা হলে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে তাঁর কৃতসংকল্প হওয়া উচিত। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার কথা বিবেচনা না করে, শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে শিষ্যের প্রস্তুত থাকা উচিত।

শ্লোক ৫১

তত্র পূর্বতরঃ কশ্চিৎসখা ব্রাহ্মণ আত্মবান্ ।
সান্ত্বয়ন্ বল্গুনা সাম্না তামাহ রুদতীং প্রভো ॥ ৫১ ॥

তত্র—সেখানে; **পূর্বতরঃ**—পূর্বতন; **কশ্চিৎ**—কোন; **সখা**—বন্ধু; **ব্রাহ্মণঃ**—একজন ব্রাহ্মণ; **আত্মবান্**—অত্যন্ত বিদ্বান; **সান্ত্বয়ন্**—সান্ত্বনা দিয়ে; **বল্গুনা**—অত্যন্ত সুন্দর; **সাম্না**—মধুর বাক্যের দ্বারা; **তাম্**—তাঁকে; **আহ**—বলেছিলেন; **রুদতীম্**—রোরুদ্যমানা; **প্রভো**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্! তখন রাজা পুরঞ্জনের এক পূর্বতন সখা ব্রাহ্মণ সেখানে এসে, মধুর বাক্যের দ্বারা রাণীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণরূপে পুরাতন এক সখার এই আগমন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই পুরাতন সখা। বৈদিক বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের সঙ্গে রয়েছেন। শ্রুতি-মন্ত্রের বর্ণনা অনুসারে (*দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াঃ*), ভগবান প্রতিটি জীবের সুহৃৎ বা প্রিয়তম বন্ধুরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। জীবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবান সর্বদাই অত্যন্ত আকুল হয়ে রয়েছেন। সাক্ষীরূপে জীবের সঙ্গে বিরাজ করে ভগবান জীবকে সমস্ত জড়-জাগতিক সুখভোগ করার সুযোগ প্রদান করেন, কিন্তু সুযোগ পেলেই ভগবান জীবকে জড় জগতে সুখভোগ করার চেষ্টা পরিত্যাগ করে, ভগবৎ-মুখী হওয়ার এবং ভগবানের শরণাগত হওয়ার উপদেশ দেন। কেউ যখন শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তখন তাঁর এই সংকল্প ভগবানকে দর্শন করারই সামিল। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, তার অর্থ হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের নির্দেশের মধ্যেই ভগবানকে সাক্ষাৎ করা। তাকে বলা হয় *বাণীসেবা। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন* (*ভগবদ্গীতা* ২/৪১) শ্লোকটির ভাষ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীগুরুদেবের বাণীর সেবা করা উচিত। শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালনে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। কেবলমাত্র তা করার ফলেই পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায়।

পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মা রাণীর সম্মুখে একজন ব্রাহ্মণরূপে এসেছিলেন। তিনি কেন তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে প্রকাশিত হলেন না? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই সম্বন্ধে বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবৎ-প্রেমের অতি উন্নত স্তরে উন্নীত না হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর স্বরূপে তাঁকে দর্শন করা যায় না। কিন্তু, কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করতে থাকেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি কোন না কোনও ভাবে ভগবানের সঙ্গে রয়েছেন। ভগবান যেহেতু হৃদয়ে বিরাজমান, তাই তিনি ঐকান্তিক শিষ্যকে অন্তর থেকে উপদেশ দিতে পারেন। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর প্রীতি সহকারে আমার আরাধনা করে, তাদের আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।"

মূল কথা হচ্ছে, শিষ্য যদি ঐকান্তিকতা সহকারে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ বাণী অথবা বপুর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করার একমাত্র রহস্য। ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনে যুক্ত থেকে এবং সেই সঙ্গে বৃন্দাবনের কোন কুঞ্জে ভগবানকে দর্শন করার জন্য আকুল হওয়ার পরিবর্তে, যদি কেবল শ্রীগুরুদেবের বাণীর অনুসরণ করা যায়, তা হলে অনায়াসে ভগবানকে দর্শন করা যায়। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাই বলেছেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥

"হে ভগবান! আমি যদি আপনার ভক্তিতে যুক্ত হই, তা হলে অনায়াসে আমি সর্বত্র আপনার উপস্থিতি অনুভব করতে পারব। আর মুক্তিদেবী তো করজোড়ে আমার সেবা করার সুযোগের প্রতীক্ষা করে আমার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এবং ধর্ম, অর্থ, কাম আদি সমস্ত জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে।" (*কৃষ্ণকর্ণামৃত* ১০৭) কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির মার্গে অত্যন্ত উন্নত হন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভগবানকে দর্শন করতে পারবেন। কেউ যদি শ্রীগুরুদেবের সেবায় যুক্ত থাকেন, তা হলে তিনি কেবল ভগবানকেই দর্শন করবেন তাই নয়, তিনি মুক্তিও লাভ করবেন। জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি আপনা থেকেই লাভ হবে, ঠিক যেমন রাণীর পরিচারিকারা সর্বদা রাণীর অনুসরণ করে থাকে। শুদ্ধ ভক্তের পক্ষে মুক্তি কোন সমস্যাই নয়, এবং সমস্ত জড় সুযোগ-সুবিধাগুলি জীবনের সব কটি স্তরেই তাঁর সেবা করার জন্য প্রতীক্ষা করে।

শ্লোক ৫২

ব্রাহ্মণ উবাচ

কা ত্বং কস্যাসি কো বায়ং শয়ানো যস্য শোচসি ।
জানাসি কিং সখায়ং মাং যেনাগ্রে বিচচর্থ হ ॥ ৫২ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—সর্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ বললেন; **কা**—কে; **ত্বম্**—তুমি; **কস্য**—কার; **অসি**—হও; **কঃ**—কে; **বা**—অথবা; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **শয়ানঃ**—শায়িত; **যস্য**—যার জন্য;

শোচসি—তুমি শোক করছ; **জানাসি কিম্**—তুমি কি জান; **সখায়ম্**—বন্ধু; **মাম্**—আমাকে; **যেন**—যাঁর সঙ্গে; **অগ্রে**—পূর্বে; **বিচচর্থ**—পরামর্শ করতে; **হ**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? তুমি কার পত্নী অথবা কন্যা? এই শায়িত পুরুষটি কে? মনে হচ্ছে যেন তুমি এই মৃত শরীরের জন্য শোক করছ। তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তোমার চিরকালের বন্ধু। তোমার স্মরণ হতে পারে যে, পূর্বে তুমি বহুবার আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলে।

তাৎপর্য

যখন কারও আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তখন আপনা থেকেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার সঙ্গে পরামর্শ করা তখনই সম্ভব হয়, যখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে জড় আসক্তির কলুষ থেকে মুক্ত হন। যিনি ঐকান্তিক এবং শুদ্ধ, তিনি সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ পান। পরমাত্মা সর্বদাই জীবের চৈত্যগুরু বা অন্তরে বিরাজমান শ্রীগুরুদেব, এবং তিনিই বাইরে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুরূপে আবির্ভূত হন। ভগবান হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং তিনি জীবের সম্মুখে এসে তাকে উপদেশও দিতে পারেন। তাই শ্রীগুরুদেব হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা থেকে অভিন্ন। কলুষমুক্ত আত্মা বা জীব প্রত্যক্ষভাবে পরমাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পান। ঠিক যেভাবে অন্তরে স্থিত পরমাত্মার সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ পাওয়া যায়, তেমনই সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মাকে দর্শন করারও সুযোগ পাওয়া যায়। তখন প্রত্যক্ষভাবে পরমাত্মার থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুদ্ধ ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সদ্‌গুরুর উপদেশ গ্রহণ করা এবং হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমাত্মার সঙ্গে পরামর্শ করা।

ব্রাহ্মণ যখন স্ত্রীলোকটিকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, ভূমিতে শয়ান ব্যক্তিটি কে, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন তাঁর গুরুদেব এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে কি করা কর্তব্য সেই সম্বন্ধে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছেন। এই রকম সময়, শিষ্য যদি শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করার ফলে অন্তরে নির্মল হন, তা হলে পরমাত্মা তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হন। যে ভক্ত নিষ্ঠা সহকারে গুরুদেবের আদেশ পালন করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর হৃদয় থেকে অন্তর্যামী পরমাত্মার প্রত্যক্ষ নির্দেশ প্রাপ্ত হন। তার ফলে ঐকান্তিক ভক্ত সর্বদাই প্রত্যক্ষভাবে

অথবা পরোক্ষভাবে শ্রীগুরুদেব এবং পরমাত্মার সাহায্য প্রাপ্ত হন। সেই কথা *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ* । ভক্ত যদি নিষ্ঠা সহকারে শ্রীগুরুদেবের সেবা করেন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। *যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎ প্রসাদঃ।* শ্রীগুরুদেবের সন্তুষ্টি-বিধানের ফলে শ্রীকৃষ্ণ আপনা থেকেই প্রসন্ন হন। এইভাবে ভক্ত শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের দ্বারাই লাভবান হন। পরমাত্মা জীবের নিত্য সখা এবং সর্বদাই তাঁর সঙ্গে থাকেন। পরমাত্মা সর্বদাই জীবকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, এমন কি এই জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বেও। তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে *যেনাগ্রে বিচচর্থ।* *অগ্রে* বলতে সৃষ্টির পূর্বে বোঝানো হয়েছে। এইভাবে পরমাত্মা সৃষ্টির পূর্ব থেকেই জীবের সঙ্গে রয়েছেন।

শ্লোক ৫৩

অপি স্মরসি চাত্মানমবিজ্ঞাতসখং সখে ।
হিত্বা মাং পদমন্বিচ্ছন্ ভৌমভোগরতো গতঃ ॥ ৫৩ ॥

অপি স্মরসি—তোমার কি মনে পড়ে; **চ**—ও; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **অবিজ্ঞাত**—অজ্ঞাত; **সখম্**—সখা; **সখে**—হে বন্ধু; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **মাম্**—আমাকে; **পদম্**—পদ; **অন্বিচ্ছন্**—কামনা করে; **ভৌম**—জড়; **ভোগ**—সুখ; **রতঃ**—আসক্ত; **গতঃ**—হয়েছ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বললেন—হে বন্ধু! যদিও তুমি আমাকে এখনও চিনতে পারছ না, তোমার কি মনে পড়ে না যে, পূর্বে তোমার এক অতি অন্তরঙ্গ সখা ছিল? দুর্ভাগ্যবশত তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে, এই জগতের ভোক্তার পদ গ্রহণ করেছ।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২৭) বর্ণনা করা হয়েছে—

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥

"হে ভারত (অর্জুন)! হে পরন্তপ! সকলেই ইচ্ছা ও বিদ্বেষের দ্বারা অভিভূত এবং মোহাচ্ছন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করে।" জীব যে কিভাবে এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়, এটি হচ্ছে তার একটি বিশ্লেষণ। চিৎ-জগতে কোন দ্বৈতভাব

নেই এবং সেখানে বিদ্বেষভাবও নেই। অধিক থেকে অধিকতর আনন্দ আস্বাদন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। *বরাহ পুরাণে* উল্লেখ হয়েছে যে, তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব *(স্বাংশ)* এবং তাঁর তটস্থা শক্তি *(বিভিন্নাংশ* বা জীব) রূপে নিজেকে বিস্তার করেন। এই প্রকার জীবেদের সংখ্যা অসংখ্য, ঠিক যেমন সূর্যের কিরণকণা হচ্ছে অসংখ্য। ভগবানের তটস্থা শক্তিজাত বিভিন্নাংশ হচ্ছে জীব। জীব যখন স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করতে চায়, তখন তার দ্বৈতভাবের উদয় হয়, এবং সে ভগবানের সেবার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়। এইভাবে জীব জড় জগতে অধঃপতিত হয়। *প্রেমবিবর্তে* বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবহির্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

জীবের স্বাভাবিক স্থিতি হচ্ছে দিব্য প্রেমে ভগবানের সেবা করা। জীব যখন নিজেই কৃষ্ণ হতে চায় অথবা শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করে, তখন সে এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পিতা, তাই জীবের প্রতি তাঁর স্নেহ নিত্য। জীব যখন জড় জগতে অধঃপতিত হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁর স্বাংশ (পরমাত্মা) বিস্তারের দ্বারা জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। এইভাবে জীব কোন না কোনদিন ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে ।

তার স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে, জীব ভগবানের সেবা থেকে বিচ্যুত হয়ে, এই জড় জগতে ভোক্তা হওয়ার পদ গ্রহণ করে। অর্থাৎ, জীব জড়দেহ গ্রহণ করে। অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়ার আশায়, জীব জন্ম-মৃত্যুর চক্রে জড়িয়ে পড়ে। মানুষ, দেবতা, বিড়াল, কুকুর, বৃক্ষ, ইত্যাদি রূপে সে তার পদ মনোনয়ন করে। এইভাবে ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন দেহধারণ করে, জীব জড়সুখ ভোগের মাধ্যমে সুখী হওয়ার চেষ্টা করে। পরমাত্মা কিন্তু চান না যে, জীব এই সমস্ত কর্মে লিপ্ত হোক। তাই পরমাত্মা তাকে ভগবানের শরণাগত হওয়ার উপদেশ দেন। ভগবান তখন জীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু জীব যতক্ষণ জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ সে ভগবানের শরণাগত হতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) ভগবান বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"ঋষিরা আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরূপে জেনে, সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের ও দেবতাদের পরম ঈশ্বর রূপে জেনে, এবং সমস্ত জীবের পরম

শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে জেনে, জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করেন।"

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম সুহৃৎ; কিন্তু, কেউ যখন স্বয়ং সুখী হওয়ার পরিকল্পনা করে জড়া প্রকৃতির গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন সে তার পরম সুহৃদের উপদেশের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। যখন সৃষ্টি শুরু হয়, তখন জীব তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। তার অর্থ হচ্ছে যে, সমস্ত যোনি অথবা জীবের রূপ একই সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। ডারউইন তার বিবর্তনবাদে বলেছে যে, শুরুতে মানুষ ছিল না, বহু বছরের ক্রম-বিবর্তনের ফলে মানুষের উদ্ভব হয়েছে, তা একটি অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব হচ্ছেন ব্রহ্মা। সব চাইতে বুদ্ধিমান হওয়ার ফলে ব্রহ্মা এই জগতে যত সমস্ত যোনি রয়েছে, সেগুলির সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৪

হংসাবহং চ ত্বং চার্য সখায়ৌ মানসায়নৌ ।
অভূতামন্তরা বৌকঃ সহস্রপরিবৎসরান্ ॥ ৫৪ ॥

হংসৌ—দুটি হংস; **অহম্**—আমি; **চ**—এবং; **ত্বম্**—তুমি; **চ**—ও; **আর্য**—হে মহাত্মা; **সখায়ৌ**—দুটি বন্ধু; **মানস-অয়নৌ**—মানস সরোবরে একসঙ্গে; **অভূতাম্**—হয়েছিল; **অন্তরা**—পৃথক; **বা**—প্রকৃতপক্ষে; **ওকঃ**—প্রকৃত গৃহ থেকে; **সহস্র**—হাজার-হাজার; **পরি**—ক্রমান্বয়ে; **বৎসরান্**—বৎসর।

অনুবাদ

হে প্রিয় সখা! তুমি আর আমি ঠিক দুটি হংসের মতো। আমরা দুজনে একত্রে একই হৃদয়ে বাস করি, যা ঠিক মানস সরোবরের মতো। যদিও আমরা বহু সহস্র বৎসর ধরে একসঙ্গে রয়েছি, তবুও আমরা আমাদের প্রকৃত আলয় থেকে বহু দূরে।

তাৎপর্য

জীব ও ভগবানের প্রকৃত আলয় হচ্ছে চিৎ-জগৎ। চিৎ-জগতে ভগবান ও জীব উভয়েই অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বাস করেন। জীব যেহেতু ভগবানের সেবায়

যুক্ত থাকে, তাই তাঁরা উভয়েই চিৎ-জগতে আনন্দময় জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু জীব যখন একা আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তখন সে এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়। সেই অবস্থাতেও ভগবান পরমাত্মারূপে, তার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে, তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকেন। বিস্মৃতির ফলে জীব জানে না যে, পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে তার সঙ্গে রয়েছেন। এইভাবে জীব প্রতি কল্পে বদ্ধ অবস্থায় থাকে। ভগবান যদিও তার সখারূপে তাকে অনুসরণ করেন, তবুও সে বিস্মৃতির প্রভাবে তাঁকে চিনতে পারে না।

শ্লোক ৫৫

স ত্বং বিহায় মাং বন্ধো গতো গ্রাম্যমতির্মহীম্ ।
বিচরন্ পদমদ্রাক্ষীঃ কয়াচিন্নির্মিতং স্ত্রিয়া ॥ ৫৫ ॥

সঃ—সেই হংস; **ত্বম্**—তুমি; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **মাম্**—আমাকে; **বন্ধো**—হে সখে; **গতঃ**—চলে গিয়েছ; **গ্রাম্য**—জড়; **মতিঃ**—চেতনা; **মহীম্**—পৃথিবীকে; **বিচরন্**—ভ্রমণ করে; **পদম্**—পদ; **অদ্রাক্ষীঃ**—তুমি দেখেছ; **কয়াচিৎ**—কারোর দ্বারা; **নির্মিতম্**—নির্মিত; **স্ত্রিয়া**—একটি স্ত্রীর দ্বারা।

অনুবাদ

হে সখে! তুমি আমার সেই বন্ধু। যখন থেকে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছ, তখন থেকে তুমি ক্রমশ জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়েছ, এবং আমাকে বিস্মৃত হয়ে, কোন স্ত্রীর দ্বারা রচিত এই জড় জগতে বিভিন্ন দেহে তুমি ভ্রমণ করছ।

তাৎপর্য

জীব যখন চিৎ-জগৎ থেকে বিচ্যুত হয়, তখন সে এই জড় জগতে পতিত হয়, যা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সৃষ্ট। এই বহিরঙ্গা শক্তিকে এখানে 'কোন স্ত্রী' বা *প্রকৃতি* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড় জগৎ মহত্তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত ভৌতিক উপাদানগুলির দ্বারা গঠিত। বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সৃষ্ট জড় জগৎ বদ্ধ জীবের তথাকথিত গৃহে পরিণত হয়। এই জড় জগতে বদ্ধ জীব বিভিন্ন বাসস্থান বা বিভিন্ন প্রকার শরীর গ্রহণ করে ভ্রমণ করে। কখনও সে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, আবার কখনও সে নিম্নতর লোকে পতিত হয়। কখনও সে উচ্চতর যোনিতে ভ্রমণ করে, কখনও বা নিম্নতর যোনিতে। অনাদিকাল ধরে সে এই জড় জগতে ভ্রমণ করছে। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৫১)

জীব এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন প্রকার যোনিতে ভ্রমণ করছে। কিন্তু সে যদি পুনরায় তার বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে অথবা তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে মিলিত হয়, তা হলে সে ভাগ্যবান।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপদেশ দেন। কখনও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠান, যিনি তাঁর বাণী প্রচার করে সমস্ত জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে অনুপ্রাণিত করেন। দুর্ভাগ্যবশত জীব জড়সুখ ভোগের প্রতি এতই আসক্ত যে, সে শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁর প্রতিনিধির উপদেশের খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। এই প্রবৃত্তিকে এই শ্লোকে *গ্রাম্যমতিঃ* (ইন্দ্রিয় সুখভোগ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *মহীম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'এই জড় জগতে'। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই ইন্দ্রিয় সুখভোগ-পরায়ণ। তাই তারা বিভিন্ন প্রকার যোনিতে আবদ্ধ হয়ে সংসারের দুঃখ ভোগ করে।

শ্লোক ৫৬

পঞ্চারামং নবদ্বারমেকপালং ত্রিকোষ্ঠকম্ ।
ষট্কুলং পঞ্চবিপণং পঞ্চপ্রকৃতি স্ত্রীধবম্ ॥ ৫৬ ॥

পঞ্চ-আরামম্—পাঁচটি বাগান; **নব-দ্বারম্**—নয়টি দ্বার; **এক**—একটি; **পালম্**—রক্ষক; **ত্রি**—তিন; **কোষ্ঠকম্**—বাসস্থান; **ষট্**—ছয়; **কুলম্**—পরিবার; **পঞ্চ**—পাঁচ; **বিপণম্**—দোকান; **পঞ্চ**—পাঁচ; **প্রকৃতি**—ভৌতিক উপাদান; **স্ত্রী**—নারী; **ধবম্**—অধীশ্বরী।

অনুবাদ

সেই নগরীর (জড় শরীরের) পাঁচটি উদ্যান, নয়টি দ্বার, একজন রক্ষক, তিনটি কোষ্ঠ, ছয়টি পরিবার, পাঁচটি দোকান, পাঁচটি উপাদান, এবং একজন স্ত্রী তার অধীশ্বরী।

শ্লোক ৫৭

পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থা আরামা দ্বারঃ প্রাণা নব প্রভো ।
তেজোঽবন্নানি কোষ্ঠানি কুলমিন্দ্রিয়সংগ্রহঃ ॥ ৫৭ ॥

পঞ্চ—পাঁচ; **ইন্দ্রিয়-অর্থাঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **আরামাঃ**—উদ্যান; **দ্বারঃ**—দ্বার; **প্রাণাঃ**—ইন্দ্রিয়ের ছিদ্র; **নব**—নয়; **প্রভো**—হে রাজন্; **তেজঃ-অপ্**—অগ্নি, জল; **অন্নানি**—অন্ন বা পৃথিবী; **কোষ্ঠানি**—কোষ্ঠ; **কুলম্**—পরিবার; **ইন্দ্রিয়-সংগ্রহঃ**—পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন।

অনুবাদ

হে সখে! পাঁচটি উদ্যান হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখভোগের পাঁচটি বিষয়, এবং তার রক্ষক হচ্ছে প্রাণবায়ু, যা নয়টি দ্বার দিয়ে প্রবাহিত হয়। তিনটি কোষ্ঠ হচ্ছে তিনটি প্রধান উপাদান—অগ্নি, জল ও মাটি। ছয়টি পরিবার হচ্ছে মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়।

তাৎপর্য

দৃষ্টি, স্বাদ, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ—এই পাঁচটি তন্মাত্র দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, একটি মুখ, দুটি নাসারন্ধ্র, একটি উপস্থ ও একটি পায়ু—এই নয়টি দ্বারের মাধ্যমে কার্য করে। এই নয়টি ছিদ্রকে নগরীর দ্বারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রধান উপাদানগুলি হচ্ছে মাটি, জল ও আগুন, এবং প্রধান কর্তা হচ্ছে মন, যা বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

শ্লোক ৫৮

বিপণস্তু ক্রিয়াশক্তির্ভূতপ্রকৃতিরব্যয়া ।
শক্ত্যধীশঃ পুমাংস্ত্বত্র প্রবিষ্টো নাববুধ্যতে ॥ ৫৮ ॥

বিপণঃ—দোকান; **তু**—তখন; **ক্রিয়া-শক্তিঃ**—কার্য করার শক্তি অথবা কর্মেন্দ্রিয়; **ভূত**—পঞ্চভূত; **প্রকৃতিঃ**—জড় উপাদান; **অব্যয়া**—শাশ্বত; **শক্তি**—শক্তি; **অধীশঃ**—নিয়ন্তা; **পুমান্**—মানুষ; **তু**—তখন; **অত্র**—এখানে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেছে; **ন**—না; **অববুধ্যতে**—জানা যায়।

অনুবাদ

পাঁচটি বিপণি হচ্ছে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। সেগুলি পঞ্চ-মহাভূতের সংযুক্ত শক্তির দ্বারা তাদের ব্যবসা করে। সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে রয়েছে আত্মা। আত্মা হচ্ছে ভোক্তা এবং সে হচ্ছে পুরুষ। কিন্তু শরীর-রূপী নগরীতে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে, সে তার স্বরূপ জানতে পারে না।

তৎ—তার সঙ্গে; **সঙ্গাৎ**—সঙ্গ করার ফলে; **ঈদৃশীম্**—এই প্রকার; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়েছ; **দশাম্**—অবস্থা; **পাপীয়সীম্**—পাপকর্মে পূর্ণ; **প্রভো**—হে সখা।

অনুবাদ

হে সখে! তুমি যখন বিষয়-বুদ্ধিরূপা রমণীর সঙ্গে এই শরীরে প্রবেশ করেছ, তখন থেকেই তুমি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছ। এই কারণে, তুমি তোমার চিন্ময় জীবনের কথা ভুলে গেছ। তার ফলে তুমি এই প্রকার পাপীয়সী দশা প্রাপ্ত হয়ে, নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছ।

তাৎপর্য

মানুষ যখন জড় বিষয়ে মগ্ন হয়, তখন তার আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে শ্রবণ করার শক্তি থাকে না। চিন্ময় অস্তিত্বের কথা ভুলে যাওয়ার ফলে, মানুষ ক্রমশ জড় বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। এটিই হচ্ছে পাপীয়সী জীবনের পরিণতি। নানা প্রকার পাপকর্মের ফলে, জড় উপাদানের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার দেহের বিকাশ হয়। রাজা পুরঞ্জন তাঁর পাপকর্মের ফলে, বৈদর্ভী-নামক স্ত্রী-শরীর ধারণ করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (*স্ত্রীয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ*) এই প্রকার শরীর অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্তরের। কিন্তু কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তিনি নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। আধ্যাত্মিক বুদ্ধির হ্রাস হওয়ার ফলে, নিকৃষ্ট স্তরের যোনিতে জন্ম হয়।

শ্লোক ৬০

ন ত্বং বিদর্ভদুহিতা নায়ং বীরঃ সুহৃত্তব ।
ন পতিস্ত্বং পুরঞ্জন্যা রুদ্ধো নবমুখে যয়া ॥ ৬০ ॥

ন—না; **ত্বম্**—তুমি; **বিদর্ভ-দুহিতা**—বিদর্ভের কন্যা; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **বীরঃ**—বীর; **সু-হৃৎ**—হিতৈষী পতি; **তব**—তোমার; **ন**—না; **পতিঃ**—পতি; **ত্বম্**—তুমি; **পুরঞ্জন্যাঃ**—পুরঞ্জনীর; **রুদ্ধঃ**—অবরুদ্ধ; **নব-মুখে**—নবদ্বার সমন্বিত দেহে; **যয়া**—জড়া প্রকৃতির দ্বারা।

অনুবাদ

প্রকৃতপক্ষে, তুমি বিদর্ভরাজের কন্যা নও, এই মলয়ধ্বজ তোমার হিতকারী পতি নয়। তুমি পুরঞ্জনীরও পতি নও। তুমি কেবল নবদ্বার সমন্বিত এই দেহে অবরুদ্ধ হয়েছ।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে বহু জীব পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, এবং পিতা, পতি, মাতা, পত্নী ইত্যাদিরূপে সম্পর্কিত হয়ে, সে তার বিশেষ শরীরের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই স্বতন্ত্র, এবং জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শের ফলে সে অন্যান্য দেহের সংস্পর্শে আসে এবং ভ্রান্তভাবে তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। পরিবার, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদির নামে, দেহের মিথ্যা পরিচয় বিভিন্ন প্রকার সংগঠন সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই ভগবানের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু জীবেরা তাদের জড় শরীরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে *ভগবদ্গীতা* এবং বৈদিক সাহিত্যরূপে উপদেশ দেন। ভগবান জীবদের এই সমস্ত উপদেশ দেন কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের নিত্য সখা। তাঁর উপদেশগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেগুলির দ্বারা জীব তার দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। নদীর প্রবাহে তট থেকে বহু খড়কুটা ভেসে যায়। ক্ষণিকের জন্য সেগুলি একত্রিত হয়, আবার তরঙ্গের আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তেমনই, এই জড় জগতে অসংখ্য জীব জড়া প্রকৃতির প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে। কখনও তারা একত্রিত হয়, এবং দেহের ভিত্তিতে সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র ইত্যাদি গঠন করে পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। অবশেষে জড়া প্রকৃতির তরঙ্গাঘাতে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই পন্থা চলে আসছে জড়া প্রকৃতির সৃষ্টির সময় থেকে। সেই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

মিছে মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে',
খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই ।
জীব কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই ॥

এই শ্লোকে সুহৃৎ এবং তব কথা দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তথাকথিত পতি, আত্মীয়স্বজন, পুত্র, পিতা, এরা কেউই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিতৈষী হতে পারে না। একমাত্র হিতৈষী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যে-কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) বলেছেন—*সুহৃদং সর্বভূতানাম্।* সমাজ, বন্ধুত্ব, প্রেম, হিতৈষী, এই সবই বিভিন্ন দেহে আবদ্ধ হওয়ার পরিণতি। সেই কথা ভালভাবে অবগত হয়ে, জন্ম-জন্মান্তরে বিভিন্ন দেহে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া উচিত।

শ্লোক ৬১

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যৎপুমাংসং স্ত্রিয়ং সতীম্ ।
মন্যসে নোভয়ং যদ্ধৈ হংসৌ পশ্যাবয়োর্গতিম্ ॥ ৬১ ॥

মায়া—মায়া; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **এষা**—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **সৃষ্টা**—সৃষ্ট; **যৎ**—যা থেকে; **পুমাংসম্**—পুরুষ; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রী; **সতীম্**—সাধ্বী; **মন্যসে**—তুমি মনে কর; **ন**—না; **উভয়ম্**—উভয়; **যৎ**—যেহেতু; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **হংসৌ**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **পশ্য**—দেখ; **আবয়োঃ**—আমাদের; **গতিম্**—বাস্তবিক স্থিতি।

অনুবাদ

কখনও তুমি নিজেকে একজন পুরুষ বলে মনে কর, কখনও বা একজন সতী স্ত্রী বলে মনে কর, আবার কখনও নপুংসক বলে মনে কর। তার কারণ হচ্ছে শরীর, যা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট। এই মায়া আমারই শক্তি, এবং প্রকৃতপক্ষে তুমি ও আমি, আমরা দুজনেই শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা। আমি তোমাকে আমাদের বাস্তবিক স্থিতি সম্বন্ধে বোঝাতে চেষ্টা করছি, তা বুঝতে চেষ্টা কর।

তাৎপর্য

ভগবান এবং জীবের বাস্তবিক স্থিতি গুণগতভাবে এক। ভগবান হচ্ছেন পরম আত্মা আর জীব হচ্ছে স্বতন্ত্র আত্মা। যদিও তাঁদের উভয়েরই আদি স্বরূপ হচ্ছে চিন্ময়, কিন্তু জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন সে তার পরিচয় ভুলে যায়। তখন সে নিজেকে জড়া প্রকৃতিজাত বলে মনে করে। জড় দেহের ফলে সে ভুলে যায় যে, সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শাশ্বত (*সনাতন*) বিভিন্ন অংশ। সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। ভগবদ্গীতার* কয়েকটি স্থানে *সনাতন* শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়। ভগবান এবং জীব উভয়েই সনাতন (নিত্য), এবং জড়া প্রকৃতির অতীত সনাতন বলে একটি স্থানও রয়েছে। জীব এবং ভগবান উভয়েরই প্রকৃত আলয় হচ্ছে সেই সনাতন ধামে, এই জড় জগতে নয়। এই জড় জগৎ হচ্ছে ভগবানের অনিত্য বহিরঙ্গা প্রকৃতি, এবং ভগবানকে অনুকরণ করতে চাওয়ার ফলে, জীবকে এই জড় জগতে অধঃপতিত হতে হয়েছে। এই জড় জগতে সে তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বিভিন্ন রকম দেহের মাধ্যমে এই জড় জগতে বদ্ধ জীবের সমস্ত কার্যকলাপ নিরন্তর সংঘটিত হচ্ছে, কিন্তু জীবের চেতনা

যখন বিকশিত হয়, তখন তার কর্তব্য হচ্ছে তার পরিস্থিতির সংশোধন করে পুনরায় চিৎ-জগতের সদস্য হওয়া। যে পন্থার দ্বারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়, তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। কখনও কখনও তাকে সনাতন-ধর্মও বলা হয়। জড় দেহের ভিত্তিতে অনিত্য বৃত্তি গ্রহণ না করে সনাতন-ধর্ম বা ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে জড় দেহের বন্ধনের সমাপ্তি সাধন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। মানব-সমাজ যতক্ষণ ভ্রান্ত জড় পরিচিতির ভিত্তিতে আচরণ করতে থাকবে, ততক্ষণ বিজ্ঞান অথবা দর্শনের তথাকথিত প্রগতি সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। সেগুলি কেবল মানব-সমাজকে বিপথে পরিচালিত করে। *অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাঃ।* এই জড় জগতে অন্ধেরা অন্ধদের পরিচালিত করে।

শ্লোক ৬২

অহং ভবান্ন চান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ্ব ভোঃ ।
ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি ॥ ৬২ ॥

অহম্—আমি; **ভবান্**—তুমি; **ন**—না; **চ**—ও; **অন্যঃ**—ভিন্ন; **ত্বম্**—তুমি; **ত্বম্**—তুমি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অহম্**—আমি যেমন; **বিচক্ষ্ব**—দেখ; **ভোঃ**—হে প্রিয় সখা; **ন**—না; **নৌ**—আমাদের; **পশ্যন্তি**—দেখে; **কবয়ঃ**—জ্ঞানী ব্যক্তিরা; **ছিদ্রম্**—দোষ; **জাতু**—যে-কোন সময়; **মনাক্**—কিঞ্চিৎ; **অপি**—ও।

অনুবাদ

হে প্রিয় সখা! আমি এবং তুমি, পরমাত্মা এবং আত্মা গুণগতভাবে অভিন্ন, কারণ আমরা উভয়েই চিন্ময়। হে সখে! প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রকৃত স্বরূপে তুমি গুণগতভাবে আমার থেকে ভিন্ন নও। সেই কথাটি বোঝার চেষ্টা কর। যারা প্রকৃতই বিদ্বান এবং জ্ঞানবান, তারা তোমার এবং আমার মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য দর্শন করে না।

তাৎপর্য

ভগবান এবং জীব উভয়েই গুণগতভাবে এক। তাঁদের মধ্যে কোন বাস্তবিক পার্থক্য নেই। মায়াবাদীরা বার বার মায়ার দ্বারা পরাভূত হয়, কারণ তারা মনে করে যে, পরমাত্মা এবং আত্মা এক, অথবা পরমাত্মা নেই। তারা ভ্রান্তিবশত এমনও মনে করে যে, সব কিছুই পরমাত্মা। কিন্তু যাঁরা *কবয়ঃ* বা বিদ্বান, তাঁরা বাস্তবিক

সত্য অবগত। তাঁরা কখনও এই প্রকার ভুল করেন না। তাঁরা জানেন যে, ভগবান এবং জীবাত্মা গুণগতভাবে এক, কিন্তু জীবাত্মা অধঃপতিত হয়ে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন মায়ার ঈশ্বর। মায়া ভগবানের সৃষ্টি (*ময়া সৃষ্টা*); তাই ভগবান হচ্ছেন মায়ার নিয়ন্তা। গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হলেও, জীবাত্মা মায়ার নিয়ন্ত্রণাধীন। মায়াবাদীরা নিয়ন্তা এবং নিয়ন্ত্রিতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৬৩

যথা পুরুষ আত্মানমেকমাদর্শচক্ষুষোঃ ।
দ্বিধাভূতমবেক্ষেত তথৈবান্তরমাবয়োঃ ॥ ৬৩ ॥

যথা—যেমন; **পুরুষঃ**—জীব; **আত্মানম্**—তার দেহ; **একম্**—এক; **আদর্শ**—দর্পণে; **চক্ষুষোঃ**—চক্ষুর দ্বারা; **দ্বিধা-আভূতম্**—দুই রূপে; **অবেক্ষেত**—দর্শন করে; **তথা**—তেমনই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্তরম্**—পার্থক্য; **আবয়োঃ**—আমাদের মধ্যে।

অনুবাদ

মানুষ যেমন দর্পণে তার নিজের প্রতিবিম্বকে তার থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করে, কিন্তু অন্যেরা দুটি শরীর দর্শন করে, তেমনই জড়-জাগতিক পরিস্থিতিতে, যাতে জীব লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও লিপ্ত নয়, ভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, মায়াবাদীরা ভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করতে পারে না। সূর্য যখন এক পাত্র জলে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন সূর্য জানে যে, সেই প্রতিবিম্ব এবং তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু যারা অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা প্রতিটি পাত্রে বহু ছোট ছোট সূর্য দর্শন করে। মূল সূর্য এবং প্রতিবিম্ব দুয়েরই দীপ্তি রয়েছে, কিন্তু প্রতিবিম্বের দীপ্তি অল্প আর সূর্যের দীপ্তি বিশাল। বৈষ্ণব দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জীব ভগবানের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। গুণগতভাবে ভগবান এবং জীব এক, কিন্তু আয়তনগতভাবে জীব হচ্ছে ভগবানের ক্ষুদ্র অংশ। পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ, শক্তিমান এবং ঐশ্বর্যবান। পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান বলেছেন, "হে সখে! তুমি এবং আমি অভিন্ন।" এই অভিন্নত্ব গুণগত, কারণ জীব যে আয়তনগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক নয়, সেই কথা বদ্ধ জীবকে

স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পরমাত্মা বোধ করেননি। আত্ম-তত্ত্ববেত্তা পুরুষ কখনও মনে করেন না যে, তিনি এবং ভগবান সর্বতোভাবে এক। জীব যদিও ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক, তবুও জীবের মধ্যে তার চিন্ময় পরিচিতি ভুলে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান কখনও তা ভুলে যান না। এটিই হচ্ছে লিপ্ত এবং অলিপ্তের মধ্যে পার্থক্য। পরমেশ্বর ভগবান নিত্যকাল অলিপ্ত, বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা কলুষিত নন। কিন্তু বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির সংসর্গের ফলে তার প্রকৃত পরিচয় ভুলে যায়; তাই যখন সে বদ্ধ অবস্থায় নিজেকে দর্শন করে, তখন সে তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দেহ এবং দেহীতে কোন ভেদ নেই। তিনি পূর্ণরূপে আত্মা; তাঁর কোন জড় দেহ নেই। পরমাত্মা এবং জীবাত্মা যদিও দেহের অভ্যন্তরে একত্রে রয়েছেন, পরমাত্মা উপাধিমুক্ত, কিন্তু বদ্ধ জীবাত্মা তার বিশেষ শরীরের পরিচিতির দ্বারা প্রভাবিত। পরমাত্মাকে বলা হয় অন্তর্যামী, এবং তিনি সর্বব্যাপ্ত। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) বলা হয়েছে, *ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত*—"হে ভারত! তুমি জেনে রেখো যে, আমি সমস্ত শরীরের ক্ষেত্রজ্ঞ।"

পরমাত্মা সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু জীবাত্মা কেবল একটি বিশেষ শরীরে আবদ্ধ। অন্যের শরীরে কি হচ্ছে তা জীবাত্মা বুঝতে পারে না, কিন্তু পরমাত্মা জানেন সমস্ত শরীরে কি হচ্ছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পরমাত্মা সর্বদাই তাঁর পূর্ণ চিন্ময় পদে বিরাজ করেন, কিন্তু জীবাত্মার নিজেকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তা ছাড়া জীবাত্মা সর্বব্যাপ্তও নয়। সাধারণত বদ্ধ অবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে তার সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কিন্তু যখন সে তার বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়, তখন সে পরমাত্মার সঙ্গে তার প্রকৃত পার্থক্য দর্শন করতে পারে। পরমাত্মা যখন বদ্ধ জীবকে বলেন, "তুমি এবং আমি এক," তা কেবল তার চিন্ময় স্বরূপে গুণগতভাবে সে যে ভগবানের সঙ্গে এক, সেই কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে (৩/২৮/৪০) উল্লেখ করা হয়েছে—

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥

অগ্নির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শিখা, স্ফুলিঙ্গ এবং ধূম। যদিও গুণগতভাবে সে সবই এক, তবুও অগ্নি, অগ্নিশিখা, স্ফুলিঙ্গ এবং ধূমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জীব জড়-জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু ভগবান কখনও আবদ্ধ হন না, সেটিই হচ্ছে পার্থক্য। *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে—*আত্মা তথা পৃথগ্ দ্রষ্টা ভগবান্*

ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ। আত্মা হচ্ছে জীবাত্মা এবং সব কিছুর দ্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবান। যদিও উভয়েই আত্মা, তবুও তাদের মধ্যে নিত্য ভেদ রয়েছে। স্মৃতিতে বলা হয়েছে—*যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি।* ঠিক যেমন আগুনে স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়, তেমনই বৃহৎ চিন্ময় অগ্নিরূপ ভগবানে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসদৃশ জীবাত্মা রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ*—"সমস্ত জীবেরা আমার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নই।" স্ফুলিঙ্গ যেমন আগুনের আশ্রয়ে থাকে, ঠিক সেইভাবে যদিও সমস্ত জীব তাঁর আশ্রয়ে বিরাজ করছে, তবুও উভয়েই পৃথক পৃথকভাবে অবস্থিত। তেমনই, *বিষ্ণুপুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদম্ অখিলং জগৎ ॥

"অগ্নি এক স্থানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, যেমন তার তাপ এবং আলোক বিতরণ করে, তেমনই ভগবান বিভিন্নভাবে তাঁর শক্তি বিতরণ করছেন।" জীবেরা তার এমনই একটি শক্তি (তটস্থা শক্তি)। এক অর্থে শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন, কিন্তু তাঁরা শক্তি এবং শক্তিমানরূপে পৃথকভাবে অবস্থিত। তেমনই *ব্রহ্মসংহিতায় সচ্চিদানন্দ* বলে বর্ণিত রূপ (*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*) মুক্ত এবং বদ্ধ জীব থেকে ভিন্ন। নাস্তিকেরাই কেবল মনে করে যে জীবাত্মা এবং ভগবান সর্বতোভাবে এক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন, *মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ*—"কেউ যদি মায়াবাদী দর্শন অনুসরণ করে বিশ্বাস করে যে, ভগবান এবং জীবাত্মা এক, তা হলে তার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে।"

শ্লোক ৬৪

এবং স মনসো হংসো হংসেন প্রতিবোধিতঃ ।
স্বস্থস্তদ্ব্যভিচারেণ নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্ ॥ ৬৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **সঃ**—তিনি (জীবাত্মা); **মানসঃ**—হৃদয়ের অভ্যন্তরে একত্রে অবস্থানকারী; **হংসঃ**—হংসের মতো; **হংসেন**—অন্য হংসের দ্বারা; **প্রতি-বোধিতঃ**—উপদিষ্ট হয়ে; **স্ব-স্থঃ**—আত্ম-উপলব্ধিতে অবস্থিত; **তৎ-ব্যভিচারেণ**—পরমাত্মা থেকে বিচ্যুত হয়ে; **নষ্টাম্**—যা হারিয়ে গিয়েছিল; **আপ**—প্রাপ্ত; **পুনঃ**—পুনরায়; **স্মৃতিম্**—প্রকৃত স্মৃতি।

অনুবাদ

এইভাবে উভয় হংসই হৃদয়ে বিরাজ করে। একটি হংস যখন অন্য হংসের দ্বারা উপদিষ্ট হয়, তখন সে তার স্বরূপে অবস্থিত হয়। অর্থাৎ সে তার কৃষ্ণচেতনা ফিরে পায়, যা সে জড় আসক্তির ফলে হারিয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*হংসো হংসেন প্রতিবোধিতঃ।* জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়কেই হংসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কারণ তারা উভয়েই শ্বেত বা নিষ্কলুষ। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি হংস শ্রেষ্ঠ এবং তিনি অন্য হংসটির উপদেষ্টা। নিকৃষ্ট হংসটি যখন অন্য হংসটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন সে জড় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেটিই হচ্ছে তার অধঃপতনের কারণ। সে যখন অন্য হংসটির উপদেশ শ্রবণ করে, তখন সে তার প্রকৃত স্থিতি বুঝতে পারে এবং পুনরায় তার শুদ্ধ চেতনায় জাগরিত হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং অসুরদের সংহার করার জন্য অবতরণ করেন। *ভগবদ্গীতার* আকারে তিনি তাঁর পরম মহিমামণ্ডিত উপদেশও প্রদান করেন। ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপায় জীবাত্মাকে তার স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হতে হয়, কারণ *ভগবদ্গীতার* বাণী কেবল পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা লাভ করতে হয় আত্ম-তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষের কাছ থেকে।

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা কর। বিনম্রতাপূর্বক তাঁর কাছে ঐকান্তিকভাবে প্রশ্ন কর এবং তাঁর সেবা কর। আত্ম-তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষ তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করতে পারেন কারণ তিনি তত্ত্বকে দর্শন করেছেন।"

(*ভগবদ্গীতা* ৪/৩৪)

এইভাবে সদ্গুরুর সন্ধান লাভ করে শুদ্ধ চেতনা প্রাপ্ত হওয়া উচিত। এইভাবে জীবাত্মা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, সে সর্বদাই পরমাত্মার অধীন। যেই মুহূর্তে জীব অধীন থাকতে না চেয়ে ভোক্তা হওয়ার চেষ্টা করে, তৎক্ষণাৎ তার ভববন্ধন শুরু হয়। যখন সে প্রভু হওয়ার এবং ভোক্তা হওয়ার মনোভাব পরিত্যাগ করে, তখন সে মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই শ্লোকে *স্বস্থঃ* শব্দটির অর্থ 'স্বরূপে অবস্থিত' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যখন মানুষ তার প্রভুত্বের অবাঞ্ছিত মনোবৃত্তি বর্জন করে, তখন সে তার স্বরূপে অবস্থিত হয়। *তদ্‌ব্যভিচারেণ* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা সূচিত করে যে, কেউ যখন ভগবানের অবাধ্য হওয়ার ফলে ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তার প্রকৃত চেতনা হারিয়ে যায়। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সে যথাযথভাবে মুক্ত অবস্থায় অবস্থিত হতে পারে। এই শ্লোকগুলি নারদ মুনির উক্তি, এবং আমাদের চেতনাকে জাগরিত করার জন্যই তিনি এই কথাগুলি বলেছেন। যদিও জীব এবং পরমাত্মা গুণগতভাবে এক, কিন্তু জীবাত্মাকে পরমাত্মার নির্দেশ পালন করতে হয়। সেটিই হচ্ছে মুক্ত অবস্থা।

শ্লোক ৬৫

বর্হিষ্মন্নেতদধ্যাত্মং পারোক্ষ্যেণ প্রদর্শিতম্ ।
যৎপরোক্ষপ্রিয়ো দেবো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ॥ ৬৫ ॥

বর্হিষ্মন্—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি; **এতৎ**—এই; **অধ্যাত্মম্**—আত্ম-উপলব্ধির বর্ণনা; **পারোক্ষ্যেণ**—পরোক্ষভাবে; **প্রদর্শিতম্**—উপদিষ্ট হয়েছে; **যৎ**—যেহেতু; **পরোক্ষ-প্রিয়ঃ**—পরোক্ষ বর্ণনায় আগ্রহী; **দেবঃ**—পরমেশ্বর; **ভগবান্**—ভগবান; **বিশ্ব-ভাবনঃ**—সর্ব-কারণের পরম কারণ।

অনুবাদ

হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি! সর্ব-কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান পরোক্ষরূপে উপলব্ধ হন বলে বিখ্যাত। তাই আমি আপনার কাছে এই পুরঞ্জনের কাহিনী বর্ণনা করেছি। প্রকৃতপক্ষে এটি আত্ম-উপলব্ধির উপদেশ।

তাৎপর্য

পুরাণে আত্ম-উপলব্ধির এই প্রকার অনেক কাহিনী রয়েছে। *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে—*পরোক্ষ-প্রিয়া ইব হি দেবাঃ। পুরাণে* বহু কাহিনী রয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উৎসাহিত করা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি বাস্তবিক তত্ত্বের বর্ণনা। সেগুলিকে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যবিহীন কতকগুলি গল্প বলে মনে করা উচিত নয়। তাদের মধ্যে কতকগুলি হচ্ছে ঐতিহাসিক তত্ত্বের বর্ণনা। কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কাহিনীর প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে আগ্রহী হওয়া। সাধারণ মানুষের পক্ষে পরোক্ষ উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগের

পন্থা হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা শ্রবণ করার পন্থা (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*), কিন্তু যারা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শুনতে আগ্রহী নয়, অথবা যারা তা বুঝতে পারে না, তারা নারদ মুনি বর্ণিত এই প্রকার কাহিনী অথবা নীতিকথা শ্রবণ করে লাভবান হতে পারে।

এই অধ্যায়ের কতকগুলি মহত্ত্বপূর্ণ শব্দের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

আদেশকারী—পাপকর্মজাত ক্রিয়া।

অগস্ত্য—মন।

অমাত্য—ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ, মন।

অর্বুদ-অর্বুদ—ভগবানের নাম, গুণ, রূপ আদি শ্রবণ এবং কীর্তন।

অরি—রোগাদি বিঘ্ন।

ভোগ—সুখ। এখানে এই শব্দটি পারমার্থিক জীবনের প্রকৃত সুখ বোঝাচ্ছে।

ভৃত্য—দেহের সেবক, যথা ইন্দ্রিয়সমূহ।

দ্রবিড়-রাজ—ভক্তি অথবা ভক্তি সম্পাদনে যোগ্য ব্যক্তি।

দ্বার—চক্ষু, কর্ণ আদি শরীরের দ্বার।

গৃহ—গৃহ। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য নির্জন স্থান অথবা ভগবদ্ভক্তের সৎসঙ্গ প্রয়োজন হয়।

ইধ্ম বাহু—শ্রীগুরুদেবের শরণাগত ভক্ত। *ইধ্ম* শব্দটি আগুনের ইন্ধনকে বোঝায়। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য হচ্ছে এই *ইধ্ম* দ্বারা যজ্ঞাগ্নি জ্বালানো। আধ্যাত্মিক উপদেশের দ্বারা ব্রহ্মচারী সকালবেলা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করে, আহুতি দেওয়ার শিক্ষালাভ করেন। তার কর্তব্য হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের কাছে গিয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করা, এবং বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে যে, শিষ্য যখন গুরুর সমীপবর্তী হয়, তখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য সমিধ্ নিয়ে যেতে হয়। বৈদিক উপদেশটি হচ্ছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

"আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করার জন্য শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে যজ্ঞ-সমিধ্ হাতে নিয়ে শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়া। এই প্রকার গুরুদেবের লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি বৈদিক সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গমে নিপুণ, এবং তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় সর্বদা যুক্ত।" (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১/২/১২) এই প্রকার সদ্গুরুর সেবা করার ফলে, বদ্ধ জীব ক্রমশ জড় সুখের প্রতি বিরক্ত হয় এবং সদ্গুরুর পরিচালনায় পারমার্থিক উপলব্ধির পথে উন্নতিসাধন করে। যারা মায়ার দ্বারা মোহিত, তারা তাদের জীবন

সার্থক করার জন্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে কখনই আগ্রহী হয় না।

জায়া—বুদ্ধি।

জীর্ণ-সর্প—পরিশ্রান্ত প্রাণবায়ু।

কালকন্যা—বার্ধক্যের অক্ষমতা।

কাম—অতি তীব্র জ্বর।

কুলাচল—নির্জন স্থান।

কুটুম্বিনী—বুদ্ধি।

মদিরেক্ষণা—*মদিরেক্ষণা* বলতে সেই রমণীকে বোঝায়, যার চোখ এত সুন্দর যে, তাকে দেখা মাত্রই মানুষ মোহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ *মদিরেক্ষণা* মানে হচ্ছে অত্যন্ত সুন্দরী তরুণী। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে *মদিরেক্ষণা* মানে হচ্ছে ভক্তির মূর্তিমতী বিগ্রহ। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হন, তা হলে তিনি ভগবান এবং গুরুদেবের সেবায় যুক্ত হন, এবং তার ফলে তাঁর জীবন সার্থক হয়। বৈদর্ভী তাঁর পতির অনুগামিনী হয়েছিলেন। তিনি যেভাবে তাঁর পতির সেবা করার জন্য গৃহসুখ পরিত্যাগ করেছিলেন, নিষ্ঠাবান শিষ্যের তেমনই পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য শ্রীগুরুদেবের সেবার উদ্দেশ্যে সব কিছু পরিত্যাগ করা কর্তব্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন *যস্য প্রসাদাদ্‌ভগবৎপ্রসাদঃ*—কেউ যদি জীবনে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে চান, তা হলে নিষ্ঠা সহকারে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে আদেশ পালন করার ফলে, পারমার্থিক জীবনে দ্রুত উন্নতিসাধন করা যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের এই উক্তিটি *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের* (৬/২৩) উক্তিটির অনুবর্তী—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"যে মহাত্মা ভগবান এবং গুরুদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপরায়ণ, তাঁর কাছেই কেবল সমস্ত বৈদিক জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।" *ছান্দোগ্য উপনিষদে* বলা হয়েছে, *আচার্যবান্ পুরুষো বেদ*—"যিনি সদগুরুর শরণাগত হয়েছেন, তিনিই সর্বতোভাবে পারমার্থিক উপলব্ধি প্রাপ্ত হন।"

মলয়ধ্বজ—চন্দনের মতো স্নিগ্ধ ভক্ত।

পঞ্চাল—ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়।

পরিচ্ছদ—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়।

পৌরজন—শরীর নির্মাণকারী সাতটি ধাতু।

পৌত্র—ধৈর্য এবং গাম্ভীর্য।

প্রজ্বার—বিষ্ণুজ্বার নামক এক প্রকার জ্বর।

প্রতিক্রিয়া—মন্ত্র এবং ঔষধি আদি প্রতিষেধক।

পুর-পালক—প্রাণবায়ু।

পুত্র—বিবেক।

সৈনিক—ত্রিতাপ দুঃখ।

সপ্ত-সুত—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, অর্চন এবং দাস্য নামক সাত পুত্র।

সৌহৃদ্য—প্রচেষ্টা।

সুত—বৈদর্ভীর পুত্র, অর্থাৎ, যিনি সকাম কর্মে উন্নতি লাভ করেছেন এবং ভগবদ্ভক্ত গুরুদেবের সান্নিধ্যে এসেছেন। এই প্রকার ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তিতে আগ্রহী হন।

বৈদর্ভী—যে রমণী পূর্বে পুরুষ ছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, পরবর্তী জীবনে স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন। *দর্ভ* মানে হচ্ছে কুশঘাস। সকাম কর্মে অথবা কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে কুশঘাসের প্রয়োজন হয়। তাই *বৈদর্ভী* শব্দটি তাঁকে বোঝায়, যিনি কর্মকাণ্ড পরায়ণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের ফলে, কেউ যদি সৌভাগ্য বশে ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্যে আসেন, ঠিক যেভাবে মলয়ধ্বজের সঙ্গে বৈদর্ভীর বিবাহ হয়েছিল, তা হলে তাঁর জীবন সার্থক হয়। তখন তিনি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করেন। কেবল সদ্‌গুরুর আদেশ পালন করার ফলে, বদ্ধজীব মুক্ত হতে পারে।

বিদর্ভ-রাজসিংহ—কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানে অত্যন্ত নিপুণ শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

বীর্য—কৃপালু।

যবন—যমদূত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পরবর্তী জন্মে পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি' নামক অষ্টবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।